শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
এম, এ, এল্ এল, ডি

প্রকাশক : সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট
২২।২৬, মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬।১৯৫৯

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
জন্ম ১৮ই বৈশাখ, ১২৯৮

মুদ্রক : শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড
৫২।৩, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

সূচিপত্র

গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-জগৎ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।' আমরা পড়ে আছি পৃথিবীর একটি কোণে, সেখান থেকে বিশ্বভুবনের ধারণা করব কি করে? আমাদের অক্ষম কল্পনাশক্তি খুব বেশি দূরে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। কবি-সাহিত্যিকদের কথা আলাদা। তাঁরা সুদূরের পিয়াসী, দূরাভিসারী তাঁদের মন। কিন্তু তাঁরাও অবাধ ভ্রমণে অক্ষম। এমন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিও বলছেন—'মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই।' কত গান, কত কবিতা, কত নাটক রচনা করলেন, তথাপি বলেছেন, কথাগুলো পায়ে হেঁটে খুব বেশি দূর যেতে পারে না। কিন্তু যখনই গানের কথায় সুর যোজনা করেছেন তখনই এই ভেবে তৃপ্তি বোধ করেছেন যে, গানের কথাগুলো ডানা মেলে উড়তে শিখেছে। ইংরেজিতে যেমন বলে winged words, সুরারোপিত সঙ্গীতকে তেমনি বলা চলে winged songs। ভিন ভাষাভাষী যারা গানের কথা বুঝবে না, তারাও সুরের ভাষা বুঝতে পারবে। কথা যদি মনকে না ছোঁয়, সুর মনকে ছুঁতে পারবে। অন্যত্র বলেছেন, 'আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।'

সঙ্গীতজ্ঞ মহলে কথা এবং সুর দু'-এর মধ্যে বহু কাল থেকে একটা দ্বন্দ্ব চলে আসছে। শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, সুরই গানের ভাষা, কথার কোন প্রয়োজনই নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কথাকে বলেছেন মুখরা। কিন্তু আমি বলি কি, মুখরাও মধুরা হতে জানে। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কবিকে কথা দিয়েই কাব্য রচনা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন সঙ্গীত রচনা করেছেন তখনও তিনি প্রথমে কবি, পরে সুরকার। যা হোক, সুরজ্ঞ ব্যক্তিরা যাই বলুন, আমার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা মোটেই অনাবশ্যক নয়। কেননা, প্রতিটি গানের কথাই কাব্যগুণে গুণান্বিত। সুরসংযোগে না শুনে যদি নিছক কাব্য হিসাবে পাঠ করা যায়, তাহলেও তাঁর গানের মাধুর্য গোপন থাকে না। কাব্যগুণই তাকে গীতময় করেছে। একশোবার স্বীকার করব যে সুরের পাখা আছে—উড়বার ক্ষমতা আছে। তথাপি বলব, গানের কথাও নিতান্ত পদাতিক নয়, কথারও পাখা আছে— winged words-এর কথা আগেই বলেছি। গীতবিতান সঙ্গীত সংকলন—গ্রন্থ হয়েও কাব্যগ্রন্থ। সত্যি বলতে কি, আমি গীতবিতানকেই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করি।

বলে নেওয়া ভাল, আমি সঙ্গীতজ্ঞ মানুষ নই, রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার নেই। রবীন্দ্রনাথ যাদের পরিহাস করে বলেছেন 'সুর-কালা' কিংবা বলেছেন 'অ-সুর' আমি

তাদের দলে। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক রূপটার চাইতে কাব্যিক রূপটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে সে গান শুনে যে আনন্দ পেয়েছে তাকে মনে করেছি উপরি পাওনা। সঙ্গীতজ্ঞরা আমার সঙ্গে একমত হবেন না, সে কথা জানি। একবার লখনউ প্রবাসী একজন বাঙালি ওস্তাদের মুখে সঙ্গীতের আলোচনা শুনেছিলাম। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পণ্ডিত। চমৎকার বক্তা, মাঝে মাঝে গান করে তাঁর বক্তব্য demonstrate করছিলেন। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। ভদ্রলোক কবি অতুলপ্রসাদ সেনের প্রিয়পাত্র। এক সময়ে বললেন, আমি অতুলদাকে বলি, আপনি তো গান লেখেন না, একেকটি essay লেখেন। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন, সঙ্গীত অত কথার প্রত্যাশী নয়। দুটি একটি পদই যথেষ্ট। বুঝতে বিলম্ব হয় না যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেও উক্ত ভদ্রলোক ওই ধারণাই পোষণ করতেন। যাক্ সঙ্গীতচর্চায় কথা এবং সুরের দ্বন্দ্ব কোন কালেই শেষ হবে না। আমি গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে রাগরাগিণীতে অজ্ঞ বলেই আমার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রধানত কথা নির্ভর। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটি সাঙ্গীতিক আলোচনা নয় ; প্রবন্ধটি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে গীতিকার এবং সুরকার—দুই-ই রবীন্দ্রনাথ নিজে—কথা তাঁর, সুরও তাঁর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেও কথার চাইতে সুরকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। গোড়ায় যে গানটির উল্লেখ করেছি তাতে বলছেন, গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখেন (এখানে গান বলতে নিঃসন্দেহে সুর সংযোগে) তখন বিশ্বভুবনের মূর্তিটা বদলে যায়—অনেক বেশি মনোহর হয়ে দেখা দেয়। বলছেন—'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।' স্বীকার করতে বাধা নেই, সুর তাঁর যতখানি মনোহরণ করে, আমাদেরও ততখানি করে বললে একটু বেশি বলা হবে। কেননা, 'আলোর ভাষা' আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয় ; 'আকাশ ভরে ভালোবাসায়' কথাটাও একটু ঝাপসা ঠেকে। যদি বলতেন—মন ভরে যায় ভালোবাসায়—তাহলে কথাটা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হত। 'আলোর ভাষা' বলতে তিনি বুঝেছেন সুরের ভাষা। ওই সুরের ভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতখানি সহজবোধ্য আমাদের কাছে ততখানি নয়। আসল কথা, সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে যত দূরে, যত গভীরে নিয়ে যেতে পারে আমাকে তা পারে না ; কেননা, সুরের ভাষাটা আমার জানা নেই। এ ছাড়া আরেকটা কথাও আছে : এ গানে আগাগোড়া যেসব কথা ব্যবহার করা হয়েছে তা বেশির ভাগই অনুভূতিসাপেক্ষ। অনুভূতির ক্ষমতা সবজোর সমান নয়। এর ফলে গানের প্রত্যেকটি পদই আমাদের কাছে একটু ঝাপসা ঠেকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, পরে যখন শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য গান রচনা করেছেন তার ভাষা অনেক সহজ হয়ে এসেছে, কারণ সে ভাষা অনুভূতির ততখানি নয়, যতখানি উপভোগের। আনন্দের আর সৌন্দর্যের উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যত পার দু' হাত ভরে লুঠ করে নাও। বলেছেন—'আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।'

সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সর্বক্ষণের সাথী। মনে একটি সুরেব গুনগুনানি সারাক্ষণ লেগেই থাকত। বলেছেন, গান আমি শিখিনি, গান আমি পেয়েছিলাম। এ তো আরোই বড় কথা। অর্থাৎ কিনা গান আপনা থেকেই এসে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। অশিক্ষিত পটুত্ব যাকে বলে সে খুব উঁচুদরের জিনিস, তারই নাম প্রতিভা। তাহলেও

বলব, জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সঙ্গীতের সাধনা করেছেন আজীবন। রাগরাগিণী সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সুগভীর। সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তা প্রকাশ পেত, এমন কি সাধারণ কথাবার্তায়ও। 'ছিন্নপত্র'র একটি চিঠিতে বলেছেন—'এতক্ষণ কোন কাজ না থাকাতে নদীর দিকে তাকিয়ে গুনগুন স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন করে আপন মনে আলাপ করছিলাম, তাতে মনের ভিতর এমন একটা সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, মুহূর্তের মধ্যে আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া তার মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা দিলে...।'

রাগরাগিণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে ভৈরবীর সঙ্গে টোড়ি এবং রামকেলির মিশ্রণে যে সুর-মাধুরীর সৃষ্টি হয় তা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। সেজন্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা আমার কাছে প্রধানত কথা-নির্ভর। কথাই মন ভুলিয়েছে, সুর ব্যতিরেকেও এর কাব্যগুণ গোপন থাকেনি। সুরের মাধুর্য থেকে যেটুকু পেয়েছি সেটুকু অধিকন্তু। এ কথা নিশ্চিত যে, সুরের জ্ঞানটি বিজ্ঞানসম্মত হলে উপভোগটি গভীরতর হত। সুরের ভাষা যথাযথভাবে বুঝিনে বলে কথার ভাষার উপরেই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। গানকে পেতে হয় সুরে রসে। সুরের দিক থেকে যা বাদ পড়েছে, রসের দিক থেকে তা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। সুরের মধ্যে রস যতখানি ধরা দেয়, কথার মধ্যে—বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে—তার চাইতে কিছু কম দেয় বলে মনে হয়নি। ইংরেজি বা অন্য ভাষায় অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র রস বিদেশিরা কথার মধ্যেই পেয়েছে, গীতের মধ্যে নয়।

বলে নেওয়া ভালো যে, আমার এ আলোচনা কথা এবং সুরের দ্বন্দ্ব নিয়ে নয়। বিষয়টা ব্যাপকতর। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু গীতিকার বা সুরকার নন। কাব্যসাহিত্যের জগতে তিনি বলতে গেলে এক বিশ্বকর্মা। গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, মৌখিক ভাষণ, অগণিত চিঠিপত্র—সব মিলিয়ে একটি গোটা জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। নাম দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্র-জগৎ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—আমাদেরও তেমনি বলতে হয়, বিপুল রবীন্দ্র-জগতের কতটুকু আমরা জানি বা বুঝি! যেমন তার বিস্তার তেমনি তার গভীরতা। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, মন্দিরের ভাষণ এবং প্রবন্ধাবলীকে যদি আলাদা আলাদা করে দেখি তাহলে বিরাট রবীন্দ্র-জগৎকে খণ্ডিতভাবে দেখা হবে, তার সমগ্র রূপটি পাওয়া যাবে না। গোড়ায় উদ্ধৃত গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, গানের ভিতর দিয়ে যখন বিশ্বভুবনকে দেখেন তখনই তাকে ঠিকভাবে দেখেন এবং চেনেন, আমরাও তেমনি বলতে পারি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর দিয়ে যদি রবীন্দ্র-জগৎটিকে দেখি তবেই সে জগৎটিকে সমগ্রভাবে দেখা যাবে, চেনা যাবে। কেননা ওই সঙ্গীতের মধ্যে কাব্য তো রয়েছেই, আছে যথেষ্ট নাটকীয়তা, তা ছাড়া ওই গানের মধ্যেই পাওয়া যাবে মন্দিরের ভাষণ এবং প্রবন্ধাবলীর গভীর মননশীলতা। সৃজনশীল এবং মননশীল রবীন্দ্রনাথকে একাধারে পেতে হলে আমাদের যেতে হবে গীতবিতানের কূজন-মুখর উদ্যানে। সেখানে তিনি নিজেকে যতখানি দিয়েছেন ততখানি আর কোথাও নয়। নিজেই বলেছেন, তোমাদের সুখের দিনে, দুঃখের দিনে দিয়েছি রচি গান, 'সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,/সে গানে মোর বহুক স্মৃতি/আর যা

সব হোক্ অবসান।' তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন সঙ্গীতকে।

এত যে বিপুল পরিমাণে লিখেছেন বলেছেন, তাতেও কি গোটা মানুষটাকে আমরা চিনতে পেরেছি? তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব যতখানি আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে, ততখানি আমাদের মনশ্চক্ষে ধরা দেয়নি। মানুষের মন বড় দুর্গম স্থান। মনের অন্তস্তলে—মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছনো বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। মনের গভীরতম কথা, গভীরতম চিন্তা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। শেক্সপীয়ার নিজের সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। তাঁর জীবন সকলের কাছে এক মহা রহস্য। ম্যাথ্ আর্নল্ড শেক্সপীয়ারকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—তুমি দু চোখ মেলে কি দেখেছিলে, কি দেখে কি ভেবেছিলে, কি ভেবে কি বলেছিলে—আমরা তার কূল পাই না। যতই ভাবি ততই অভিভূত হই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতখানি বলা চলে না। তিনি কখনই আত্মগোপন করেননি। কি ভেবে কি করছেন সে কথা সর্বদাই খুলে বলেছেন। কাজেই তিনি বোধের অগম্য নন, তবে খুব সহজবোধ্য নন, এ কথা স্বীকার করতে হবে। দুর্বোধ্য এই কারণে যে রচনাবলীর গহন অরণ্যে পাঠক একটু দিশেহারা বোধ করে।

গান্ধীজীর কাছে একটি message বা বাণী প্রার্থনা করা হয়েছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন— My life is my message —আমার জীবনই আমার বাণী। সকল মহাপুরুষ সম্পর্কেই এ কথা বলা চলে। তাহলেও বলব, গান্ধীজীর জীবন কর্মময়। কর্মের ভাষা যত সহজবোধ্য, কাব্যের ভাষা এত সহজবোধ্য নয়। কবি শিল্পীর জীবন প্রধানত মননের জীবন। চাক্ষুষ ক্রিয়াকর্মের চাইতে মননের ক্রিয়াটা ঢের বেশি জটিল। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে গান্ধীজীর কর্মময় জীবনে মননের অংশটা বড় কম ছিল না। একটি বিরাট জাতির মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় তাঁকে ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছে প্রচুর। আবার রবীন্দ্রনাথও শুধু কাব্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরও কর্মকাণ্ড খুব ছোট ছিল না। এক সময় বিস্তীর্ণ জমিদারি পরিচালনা করেছেন, পরে জমিদারির কাজ ছেড়ে এসে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ক্রমে সে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এবই সঙ্গে চলেছে শ্রীনিকেতনে তাঁর গ্রাম সংগঠনের উদ্যোগ আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ কাজের মানুষ ছিলেন, কাজ ভালোবাসতেন। কিন্তু সে কাজকে হতে হবে আনন্দময়। নিরানন্দ কাজ নিতান্তই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু হুকুম মেনে কাজ করলে চলবে না; কাজ করতে হবে মনের আনন্দে। যে কাজে মন নেই সে কাজ নীরস এবং নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য। মনের আনন্দে কাজ করাকেই বলে মনেপ্রাণে কাজ করা। গানের সুরেই বলেছেন—'আনন্দ সর্ব কালে, আনন্দ সর্ব কাজে।' চাষী মাঠে চাষ করছে, তাও বলছে, 'আমরা চাষ করি আনন্দে।' যে কাজই করুক না কেন, তার মধ্যেই একটু আনন্দের আমেজ থাকবে। বলেছেন—'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ।' খেলায় আর কাজে তফাত রাখেননি। কাজটাও খেলার মতোই উপভোগ্য হবে। মননশীল মানুষ ছিলেন বলেই মনটাকে সকল কাজে ডেকেছেন। জানতেন যে, যে-কাজে মন নেই, সে-কাজে প্রাণ নেই।

রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে কোথাও একটি ছেলেমানুষ বা চিরকিশোর লুকিয়ে ছিল। সে ছেলে-মানুষটা যখন তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। বয়স তাকে কখনো দাবিয়ে

রাখতে পারেনি। হঠাৎ বলে উঠলেন—'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে তারে আজ থামায় কে রে।' থামাবার চেষ্টা তিনি নিজেও করেননি, অপরকেও করতে দেননি। মেতে উঠবার একটা প্রবণতা বরাবর থেকে গিয়েছিল। 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে।' পাগলামি তো বটেই, মাতলামি করতেও কোন আপত্তি ছিল না। বলছেন—'বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যা বেলা কোন্ বলরামের আমি চেলা।' বলরাম একটু অতিমাত্রায় মদ্যাসক্ত ছিলেন। কবি বলছেন, আজকের এই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যেন নেশায় পেয়েছে। প্রকৃতির এই পাগলামির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমারও বলরামের চেলা সেজে মাতলামি করতে ইচ্ছে করছে। ওই ছেলেমানুষি এবং পাগলামি মিলে কবিকে করেছে চিরতরুণ আর তাঁর কাব্যকে করেছে প্রাণবন্ত। মনকে কি করে চিরনবীন, চিরতরুণ রাখা যায়, এটি ছিল তাঁর চিরজীবনের সাধনা। শুধু তাই নয়, এটি রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের একটি মূল কথা। বার্ধক্যকে রোধ করা যায় না, কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। দেহের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করুক, কিন্তু মন যেন জরাগ্রস্ত না হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সে দুর্দৈব ঘটেনি। দেহ অশক্ত হয়েছিল কিন্তু মন শেষ পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ সতেজ এবং সজীব। জীবনের সর্বশেষ রচিত কবিতাটিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। সেখানেও কণ্ঠ পূর্ববৎ তরুণ।

মানুষটি একাধারে মননশীল এবং সৃজনশীল। মননের মধ্যেই সৃজনের বীজ। ভাবুক মন সারাক্ষণই মনের মধ্যে নানা ভাব, নানা চিন্তা নিয়ে খেলা করছে। সকল সৃষ্টির মূলে ওই মনের খেলা। মন না খেললে সৃষ্টি হয় না। সৃজনশীল মন সর্বক্ষণ খেলার আনন্দে মত্ত। অকারণ পুলকে কবির মন ক্ষণে ক্ষণেই গেয়ে ওঠে ; তখনই কবিতার জন্ম হয়েছে, গান রচিত হয়েছে। আনন্দ-তৃষার সঙ্গে যুক্ত ছিল সৌন্দর্য-তৃষা। ওই সৌন্দর্য-বোধটি পৈতৃক সম্পত্তি। মহর্ষি একদিকে যেমন ভগবদ-প্রেমিক, অপর দিকে তেমনি সৌন্দর্য-প্রেমিক। তিনি বলতেন, শাস্ত্রে বিশ্ব-স্রষ্টাকে বলা হয়েছে প্রজ্ঞান-ঘন। আমার যৎসামান্য জ্ঞান, তাই দিয়ে আমি জ্ঞান-স্বরূপের ধারণা করব কি করে ? সে জন্যে আমি তাঁর ধ্যান করি সৌন্দর্য-ঘন রূপে, সৃষ্টির অনন্ত সৌন্দর্য আমার চোখের সুমুখে প্রসারিত। এই অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যেই আমি প্রজ্ঞান-ঘনকে সৌন্দর্যঘন রূপে প্রত্যক্ষ করি, উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথেরও মনপ্রাণ ওই সৌন্দর্যে মোহিত। এই যেমন বলেছিলেন—'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' তেমন আবার বলতে পারতেন, 'তার অন্ত নাই গো যে সৌন্দর্যে ভরা এই বিশ্ব ভূমণ্ডল'। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীর কবিকুলের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়তা বোধ করেছেন কীট্‌স-এর সঙ্গে। নানা সময়ে, নানা প্রসঙ্গে কীট্‌স-এর উক্তি— Beauty is Truth, Truth Beauty —বারংবার উল্লেখ করেছেন। এটিকে তিনি একটি অতি প্রগাঢ় উক্তি বলে মনে করতেন। কীট্‌স-এর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বলতে পারতেন— 'I have loved the principle of beauty in everything.'

আনন্দের সাধনা এবং সুন্দরের আরাধনা—এই দুই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন। তিনি যে দেবতার পূজা করেছেন তিনি একদিকে আনন্দরূপমমৃতম যদ্বিভাতি, অপর দিকে 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।' জীবনকে দেখেছেন একটি উৎসব

হিসাবে। প্রতিটি দিন যেন একটি আনন্দের বার্তা নিয়ে দেখা দেয়। প্রতি দিনের সূর্যোদয়কে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছেন। বলেছেন—'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।' ইংরেজ কবি যখন বলেছেন, 'The sunshine is a glorious birth' তখন তিনিও একই ভাব নিয়ে সূর্যোদয়কে দেখেছেন। প্রতি দিনের সূর্যোদয়ে আলোর ঝর্ণায় স্নান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।' প্রাত্যহিকতার অভ্যাস-জীর্ণ জীবনে মনের উপরে যে মলিনতার প্রলেপ পড়ে যায় এই আলোর ঝর্ণায় তা ধুইয়ে নিতে হবে। আনন্দ এবং সৌন্দর্যের স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার মুক্তি-স্নান হয়ে গিয়েছে। আনন্দ তার মনকে আজীবন সজীব রাখবে, সৌন্দর্যবোধ তার স্বভাবকে মাধুর্যময় করে তুলবে। সুন্দর এবং আনন্দ—দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, একে অন্যের মধ্যে লীন। যেখানে সুন্দরের সাক্ষাৎ মিলল সেখানেই আনন্দ এসে জুটল। কবি দুটিকে আলাদা করে দেখেননি। যে মুহূর্তে বলেছেন -'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'—সে মুহূর্তেই আবার বলেছেন—'নয়ন আমার রূপের পুরে/সাধ মিটিয়ে বেড়ায় ঘুরে/ শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।' যখন বলেছেন—'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' তখন বলতে ভোলেননি—'দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে/পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া।' এই অমৃতরসই সৌন্দর্য-সুধা, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা দিবানিশি তাই দান করছে।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে যখন ভাষণ দিয়েছেন তখন বলেছেন—আমি তোমাদের চোখ বুজে ধ্যান করতে বলছি না, চোখ মেলে দেখতে বলছি—চেয়ে দেখ, কী অপূর্ব সুন্দর এই সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী ; লতায় পাতায়, বৃক্ষশাখায়, ফুলে ফলে চতুর্দিকে কী অন্তহীন সৌন্দর্যের সমারোহ। আনন্দ আর সৌন্দর্যের কথা বলেছেন অবিরাম। কখনো গেয়ে উঠেছেন—'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে', কখনো বলেছেন—'এ কী এ সুন্দর শোভা', আবার বলেছেন—'এ কী লাবণ্যপূর্ণ প্রাণ।' এমন আরো যে কত গান, বলে শেষ করা যায় না।

বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তখনই বলেছেন, আমি বিদ্যার মন্দিরে আনন্দের এবং সুন্দরের আসন পেতে দিলাম। একটুও বাড়িয়ে বলেননি ; আনন্দকেই করেছেন শিক্ষার মিডিয়াম। মনের আনন্দে যা শেখে, মন তাকেই ধরে রাখে। সে জিনিস সে সহজে ভোলে না। সে শিক্ষাই মনকে সজীব রাখে, মুখের বাক্যকে সরস করে, দেহমনের পুষ্টিসাধন করে। তাঁর বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চার স্থান নয়, গুণচর্চার স্থান। শুধু বিদ্বান মানুষ চাননি, চেয়েছেন গুণবান মানুষ। সে মানুষ তৈরি করেছেনও। পুথিগত বিদ্যায় মাথা খেলেনি কিন্তু চিত্রকলা বা ভাস্কর্যে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, দেশ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরীক্ষা পাশের নির্জীব নিরানন্দ কাজে তাঁদের শক্তির অপচয় ঘটতে দেননি। সুকণ্ঠ সুকণ্ঠীরা সঙ্গীতচর্চা নিয়েই মেতেছেন, নিজেরা আনন্দ পেয়েছেন, শত সহস্রকে আনন্দ দিয়েছেন। শাস্ত্রে বলেছে—বিদ্যা বৃংহনানাং অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের মতেও মনকে যা পুষ্ট করে তাই প্রকৃত বিদ্যা। যাঁরা লৌকিক অর্থে বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত থেকেছেন, কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা পাশ করে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরাও আশ্রমের আনন্দময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেননি : উৎসবে ব্যসনে, খেলাধুলায়,

সাহিত্যসভায়—সব কিছুতে পরম উৎসাহে যোগদান করেছেন। বিদ্যাচর্চাটাকেও আনন্দচর্চার অঙ্গ হিসাবেই দেখা হয়েছে। 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ' এখানেও প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেখে খুব মজা লাগত, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার হল-এ যাচ্ছে (তখন পরীক্ষাটা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন)—মিলিত কণ্ঠে গান ধরেছে—'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।' উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের গুণেই কিছু সংখ্যক ছাত্র পরবর্তীকালে লেখক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে শান্তিনিকেতন-শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

জীবনের মধ্যে একটা উল্লাসের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ সে উল্লাসের ভাবটিকে শুধু ছেলেমেয়েদের মনে নয়, সমস্ত আশ্রমবাসীর মনে ধরিয়ে দিয়েছেন। বৎসরব্যাপী নানা উৎসবের আয়োজন—বারো মাসে তেরো পার্বণ। পার্বণহীন বাকি দিনগুলিও নিতান্ত নিথর নির্জীব ছিল না। স্বভাবগুণে প্রতিটি দিনই ছিল প্রাণচঞ্চল, আনন্দমুখর। আমি অন্যত্র বলেছি যে, বহু লোক শান্তিনিকেতনে যান নানা উৎসব দেখতে ; কিন্তু তাঁরা জানেন না যে শান্তিনিকেতনের জীবনটাই একটা উৎসব। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী নেতা রামমনোহর লোহিয়া পুলিশের নজর এড়িয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে আত্মগোপন করে ছিলেন। শান্তিনিকেতনের সদানন্দ সদাচঞ্চল জীবনটিকে দেখে তিনি খুব চমৎকৃত হয়েছিলেন। বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, বাঃ Life seems to be a perpetual picnic here. বলে নেওয়া ভালো, পিকনিক বলতে শুধু সস্তাদরের আমোদ ফুর্তি নয়—বনভোজন নয়, জীবনের ভোজ। নানা দুঃখ কষ্ট অভাব অনটনের মধ্যেও জীবনটাকে সাধ্যমতো উপভোগ্য করবার দিকে সর্বক্ষণ নজর ছিল। অম্বু মধ্যে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—'আমার মতে জীবনটাতে ভালোটারই প্রাধান্য/মন্দ যদি তিন চল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।' এ জন্যে তাঁর অগণিত গানে কবিতায় একটি যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভোজে আমন্ত্রণ। জীবনে উল্লাসের কথা আগে বলেছি। আমাদের বর্ষায় ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যেও সেই উল্লাসের ভাবটা আছে। ছেলেমেয়েদের দেখেছি বৃষ্টিতে ভিজে প্রাণের আনন্দে গান করছে—'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।' বলেছেন—'অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল।' বর্ষা গিয়ে শরৎ এসেছে তো ছেলেমেয়েরা প্রাণ খুলে গেয়েছে—'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি।' অপর একটি গানে বলেছেন—'আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।' কাশের গুচ্ছ এবং শেফালি মালায় সজ্জিতা শারদলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে গান ধরেছেন—'আমার নয়ন ভুলানো এলে/আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।' বসন্ত সমাগমে ছেলেমেয়েরা বৈতালিকে আশ্রম পরিক্রমা করে গেয়েছে—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্ভার, তার প্রতি নিরন্তর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শান্তিনিকেতন পাঁজিপুথি মেনে চলে না। কিছু উৎসব পার্বণ আছে, সেগুলো তার নিজস্ব সৃষ্টি—পৌষ উৎসব, বসন্তোৎসব, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ ইত্যাদি। এ সব উৎসব শান্তিনিকেতনের জীবনকে বর্ণাঢ্য করেছে, সন্দেহ নেই। বহিরাগত দর্শকদের ভিড় এ সব উপলক্ষেই সাধারণত হয়ে থাকে। আমি এ সব

উৎসবের কথা বলছি না। শান্তিনিকেতনে দিনের পর দিন যে দৈনন্দিন জীবন তার মধ্যেই একটা উৎসবের আমেজ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনা, কিন্তু তাকেই ঘটা করে একটা উৎসবের আকার দেওয়া হত। সঙ্গীতই ছিল সে উৎসবের প্রধান উপাদান। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথই সকল নাটের গুরু। তিনিই উস্কিয়ে দিতেন, এগিয়ে এসে গান বেঁধে দিতেন। আশ্রমে দারুণ জলকষ্ট ; গ্রীষ্মে সব ক'টি কুয়ো যায় শুকিয়ে। স্থির হল নলকূপ বসানো হবে। আশ্রমবাসী সকলে তাই নিয়ে মেতে উঠল। ঘটা করে নলকূপের প্রতিষ্ঠা হল। কবি গান বেঁধে দিলেন—'মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে/মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে।' অপর একটি গানে বললেন—'হে আকাশবিহারী নীরদ-বাহন জল/আছিল শৈল শিখরে শিখরে তোমার লীলাস্থল।' সেই গানটিতেই পরে বলছেন—'শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,/কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার গভীর তিমির তল।' বলা বাহুল্য, সে নলকূপে খুব বেশি দিন জল ওঠেনি। তথাপি সে দিনের সেই আনন্দ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

এক সময়ে চা-এর আড্ডা বসত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। দিনুবাবু হঠাৎ গেলেন চলে। ততদিনে চা পিয়াসীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। অধ্যাপক কর্মীরা স্থির করলেন চা-এর আসরটা আবার জমাতে হবে। যে কথা সেই কাজ। একটি অতি সুদৃশ্য গোলাকৃতি কাঠের মঞ্চ তৈরি হল ; নাম দেওয়া হল চা-চক্র। প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রের সদ্য-রচিত সংগীত গীত হল—'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল চল' চল' চল' হে/ টগ' বগ'-উচ্ছল কাথলি-তল-জল কল-কল' হে।' যে কোন উপলক্ষে গান রচিত হত। একবার খুব মজা হল। একদল কর্মী অধ্যাপক এসে কবিকে বললেন, সারা বছর ধরে কত রকমের উৎসব হয় ; কিন্তু আমাদের স্থান হয় না কোনটাতে, কেননা, আমাদের গলায় সুর নেই, অভিনয়ের কলাকৌশলও জানা নেই। এবারে আমরা আনাড়িরা একটা অনুষ্ঠান করব। কবি বললেন, আলবৎ করবে, আমি তোমাদের জন্যে গান লিখে দিচ্ছি। একগুচ্ছ গান লেখা হয়ে গেল—'আমরা না-গান গাওয়ার দল রে, না-গলা সাধার', 'ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ/তিনটে চারটে পাশ করেছি, নই নিতান্ত মুকখ/তুচ্ছ সা-রে-গামায় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়।' খুব আড়ম্বর করে সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। আনাড়িরা নিজেদের নাম দিয়েছিলেন হৈ হৈ সংঘ। কিছুদিন আগে 'বর্ষা মঙ্গল' অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। হৈ হৈ সংঘ নিজেদের অনুষ্ঠানের নাম দিলেন 'ভরসা মঙ্গল'। সে সব দিন কবে গিয়েছে চলে। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের স্মৃতি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

এখানে একটি কথা বলে নিলে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়েছেন, শান্তিনিকেতনও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে কিয়ৎ পরিমাণে গড়েছে। আগে দেখেছি, জমিদারি পরিচালনার ভার যদি না নিতেন তাহলে 'গল্পগুচ্ছ' লেখা হত না, 'ছিন্নপত্র' আমরা পেতাম না, দেশের দুঃস্থ জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটত না, গ্রাম সংগঠন বা শ্রীনিকেতনের কথা ভাবতেন না। শান্তিনিকেতন ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথ বড় কবি হতেন কিন্তু গীতসুধারস এমন অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হত না। শান্তিনিকেতন-জীবনের সহস্র তাগিদ মিটাতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, তার প্রাণময়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে শান্তিনিকেতনের দান

অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন সংগীতকে। কোন ছেলে বা মেয়ের পড়াশোনায় মাথা খেলছে না ; তিনি বলতেন, ও নিয়ে ওকে জ্বালিয়ো না। গান শিখিয়ে দাও তাই নিয়েই জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। বলতেন, মনের মধ্যে নানা রকমের গ্রন্থি থাকে, জট পাকিয়ে যায়। একটু সুরের চর্চা করুক, গলা ছেড়ে গান করুক, গ্রন্থি মোচন হবে, জট ছেড়ে যাবে। বিদ্যে না হোক, বুদ্ধি খেলবে। সুরের মধ্যে মনটা মুক্তি পাবে। শাস্ত্রে বলেছে, সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মনকে মুক্তি দেবে। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যালয় শুধু বিদ্যাচর্চারি স্থান নয়, গুণচর্চার স্থান। ছাত্ররা যার যেটা মনে ধরবে এমন কোন গুণের চর্চা করবে—গান করবে নয়তো ছবি আঁকবে, মূর্তি গড়বে, চামড়ার কাজ করবে, কেউ-বা মাটির কাজ।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কেবলমাত্র পাঠ্য কেতাবের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। শিক্ষাকে দেখেছেন অনেক ব্যাপক দৃষ্টিতে। তাঁর মতে, শিক্ষা জিনিসটা মূলত মানুষের আত্মীয়তা বিস্তারের চর্চা। শিক্ষা মানুষের আত্মীয়তা বোধকে প্রসারিত করবে—আপন পরিবার-পরিজন থেকে প্রতিবেশী সমাজ, প্রতিবেশী মহল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলবাসীর মধ্যে, অঞ্চল ছাড়িয়ে সমগ্র দেশ, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে—সর্ব মানবের মধ্যে ব্যাপ্ত হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুধু মানুষের কথা ভেবেই ক্ষান্ত হননি ; প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদ-জগতের কথাও ভাবতে ভোলেননি। বৃক্ষরোপণ উৎসবে ছেলেমেয়েরা গান করেছে—'আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে, অতিথি-বালক তরুদল/মানবের স্নেহ সঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।' যেখানে বৃক্ষ সেখানে পক্ষিকুলের আগমন হবে। তারা দিনমান গান শোনাবে। পক্ষীর সঙ্গে মানুষের সখ্য স্থাপিত হবে। সঙ্গ দেওয়া, সঙ্গ লাভ করা শিক্ষার মস্ত বড় অঙ্গ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিশু বিভাগের ছেলেমেয়েরা যেখানে থাকত সেখানে তাদের সঙ্গে থাকত একটি কুকুর, দুটি খরগোস, একটি ময়ূর এবং আরো কিছু পাখি ; ছেলেরাই এদের দেখাশোনা করত, রান্নাঘর থেকে খাবার এনে খাওয়াত।

বলা বাহুল্য, মানুষের সঙ্গে পশুপাখির খুব একটা বিরোধ নেই। আসল বিরোধ মানুষে মানুষে—ধর্মবিরোধ, ভাষাবিরোধ, জাতিবিরোধ। এ নিয়ে পৃথিবীময় যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীময় জাতি-বিরোধ দূরীকরণ রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। ভেবেছেন, ভারতবর্ষকেই পথ দেখাতে হবে। ভারতবর্ষই হবে সর্বমানবের মিলনস্থান। তখনই লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত গান—'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে/এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' রবীন্দ্রনাথ ভারতকেই বলেছেন মহামানবের মিলনক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, সর্বমানবের মিলন ভারতের চিরন্তন বাণী। আজ থেকে হাজার বছর আগে শঙ্করাচার্য বলেছিলেন—ভ্রাতরঃ সর্বে মানবাঃ—সকল মানুষই আমার ভ্রাতা ; বলেছিলেন—স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্—ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পূর্ব মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের একটি মাত্র দেশ আছে, সে দেশের নাম বসুন্ধরা, একটি মাত্র জাতি আছে, সে জাতির

নাম মনুষ্য জাতি। শিক্ষা মানুষের মনকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে উদার মানবপ্রেমের পথে চালিত করবে, এই ছিল রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের প্রধান কথা।

বলা বাহুল্য, এ সব খুব বড় দরের কথা ; এর ফল সময়সাপেক্ষ। অব্যবহিত সময়সীমার মধ্যে কিছু আশা করা বৃথা। আমার মতে, তাঁর শিক্ষাদর্শের সব চাইতে বড় কথা হল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে কি করে সহজ সুন্দর সরস করে তোলা যায় তার পথনির্দেশ। আনন্দচর্চা সৌন্দর্যচর্চার কথা আগেই বলেছি। সহজাত সৌন্দর্যবোধ যদি থাকে তাহলে কত সামান্য উপকরণ যে জীবনকে সুষমামণ্ডিত করতে পারে তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গানটিতে—'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' সামান্যটুকুই মনকে মাতিয়ে তুলতে পাবে। তুচ্ছকে তাচ্ছিল্য করেননি, সামান্যকে অসামান্য করেছেন। বলেছেন—'এই যে এসব ছোটখাটো, পাই নে এদের কূলকিনারা/তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজও আমার হয়নি সারা।' শেষ করেছেন এই বলে —'লাগল ভালো/মন ভোলাল/এ কথাটাই গেয়ে বেড়াই/লাগল ভালো।'

আনন্দচর্চার ন্যায় বিদ্যাচর্চায়ও রোমাঞ্চ আছে। শান্তিনিকেতনে বিদ্বান পণ্ডিতরা সারাক্ষণ সৃজনশীল বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত ছিলেন ; গুণী ব্যক্তিরা চিত্রকলায় ভাস্কর্যে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পূর্বে যে উপভোগ্য জীবনে আনন্দেব ভোজের কথা বলেছি, এই বিদ্যাচর্চা এবং গুণচর্চাও সেই আনন্দের ভোজ। কবি সেই রোমাঞ্চময় আনন্দের ভোজে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—'সবারে করি আহ্বান/এসো উৎসুক চিত্ত, এস আনন্দিতপ্রাণ/হৃদয় দেহ পাতি হেথাকার দিবারাতি/করুক নবজীবন দান।'

শুধু বিদ্যাচর্চার দ্বারা যেমন শিক্ষার পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না তেমনি আনন্দচর্চা এবং সৌন্দর্যচর্চা যত বড় জিনিসই হোক তাকেও সর্বার্থসাধিকা বলা চলে না। শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হবে যখন শিক্ষা মানুষকে সত্যের সন্ধান দেবে এবং সত্যের পথে চালিত করবে। স্বীকার করতে হবে, সৌন্দর্যতৃষ্ণা সত্যনিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক ; যে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ মজ্জাগত হয়েছে, যে-কোন অসৎ কার্য, অসৎ চিন্তা তার কাছে কুৎসিত বলে মনে হবে। সমাজের শ্রী সৌন্দর্য রক্ষা করবেন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই। শেষ পর্যন্ত সেই কীট্স-এর কাব্যেই আবার ফিরে আসতে হয়—'Beauty is Truth, Truth Beauty/ That is all Ye Know on earth and all Ye need to Know.' এই একটি কথা জানা থাকলে কিছুই আর জানবার বাকি থাকে না। ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন সত্যনিষ্ঠাকে। বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে সকল অনুষ্ঠানে সমাপ্তি-সঙ্গীত হিসাবে যে গানটি মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হত সেটি হল :

'মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।'

ছাত্রদের যে সত্যব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন, কবি নিজে সে ব্রত পালন করেছেন আজীবন। বলেছেন :

'যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভ চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয়।'

পরে স্কুল সঙ্গীত হিসাবে রচিত হয়েছে—'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।' তার আগে 'মোরা সত্যের 'পরে মন করিব সমর্পণ' গানটিই স্কুল সংগীত হিসাবে ব্যবহৃত হত।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ তাঁর সংগীতের মধ্যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সংক্ষেপে তারই আলোচনা করা গেল। এবারে দেখতে হবে তাঁর নিজ জীবনাদর্শ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সংগীতের মধ্যে। মনে পড়ছে বালক বয়সে আমার পিতৃদেব একটি প্রার্থনামন্ত্র আমাদের শিখিয়েছিলেন। সে মন্ত্রটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়, বাংলা ভাষায় লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলায়। সেটি আমরা কণ্ঠস্থ করেছিলাম, আবৃত্তি করতাম। প্রথমে ধারণা ছিল এটি একটি কবিতা, পরে জেনেছি কবিতা নয়। এটি একটি রবীন্দ্রসংগীত। আরো পরে বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে গানটি শুনেছিই। গানটি হল—'আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে/দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে।' লোভের বশে, হিংসার বশে মানুষ কত সময়ে অপরের প্রতি অন্যায় অবিচার করে : ক্রোধের বশে অপরের দুঃখে সুখ বোধ করে। বলেছেন, এসব অপরাধ কখনো যদি করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা কোরো না, তোমার আপন হাতে আমার বিচার কোরো। গানটি শেষ করেছেন এই বলে--'তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায় কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়, আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে/আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে' জীবনের লক্ষ্যটিকে কত উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন, এ গানটিতেই তার প্রমাণ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রূপে গুণে, ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিধাতাপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে একেবারে উজাড় করে দিয়েছেন। তা দিয়েছেন বটে, কিন্তু এক হাতে যেমন দিয়েছেন অনেক, অপর হাতে আবার কেড়েও নিয়েছেন অনেক। এ ছাড়া আরেকটা কথাও আছে। বিধাতার কৃপায় মনুষ্যজীবন লাভ করা যায় ; কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে নিজ গুণে, নিজ সাধনাবলেই তা লাভ করতে হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্তই পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনটি পর্যালোচনা করে দেখলেই বোঝা যাবে, তাঁর জীবনটি ঠিক কুসমাকীর্ণ ছিল না, বরং কণ্টকাকীর্ণই বলতে হবে। জীবনে শোক তাপ, মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন প্রচুর। পত্নী এবং পর পর তিনটি সন্তানকে হারিয়েছেন স্বল্পকাল মধ্যে। বৃহৎ পরিবার, পরম স্নেহভাজন কনিষ্ঠরা অনেকে চলে গিয়েছে অকালে, মনের অন্তস্তলে গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে। অপর দিকে আবার নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও আশানুরূপ ব্যবহার পাননি। বহু ব্যাপারে আপন বিশ্বাসে অটল ছিলেন বলে জীবনে বন্ধুবিচ্ছেদও কিছু কম ঘটেনি। আদর্শবাদী মানুষের জীবনে এ দুর্দৈব ঘটেই থাকে। বিশ্বখ্যাতি লাভের পরে অসূয়াবশত দেশে-বিদেশে বেশ কিছু শত্রু লাভও হয়েছিল। বন্ধুজনের মুখেও বিষোদ্গার হয়েছে প্রচুর। খ্যাতি-অখ্যাতি কোনটাই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সহনশীলতা অত্যাশ্চর্য। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি কখনো বড় করে দেখেননি। সমস্তই অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এত যে শোক তাপ পেয়েছেন, তাও মুখ ফুটে কারো কাছে এতটুকু মর্মবেদনা প্রকাশ করেননি। পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুদিনেও সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে এমন স্বাভাবিক এবং নির্বিকার চিত্তে কথাবার্তা বলেছেন যে, শোকের বার্তা তাঁরা জানতেও পারেননি, বুঝতেও পারেননি।

কঠিনতম দুঃখকেও বিধাতার দান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কতখানি অবিচলিত হৃদয় হলে বলা সম্ভব--'এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো/এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।' বলতে চেয়েছেন, জীবনবিধাতা আমাকে পরীক্ষা করে, যাচাই করে নিচ্ছেন। এই যে আঘাতের পর আঘাত, এ বৃথা যাবে না, এর দ্বারা নিশ্চিত কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে ; হয়েছেও। দুঃখ একটা উদ্দীপনা। দুঃখের উত্তাপে মানুষের সকল অনুভূতি সজাগ হয়ে ওঠে, দুঃখের আঘাতে সহনশীল মানুষের মনোবল শতগুণে বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা বাড়ে, মনুষ্যত্বের মহিমা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়। এই কথাটি বলেছেন অনুপম উপমা সহযোগে—'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে/আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো।' মৃত্যুকে একটা অবিমিশ্র অকল্যাণ হিসাবে দেখেননি : বিধাতার ইচ্ছার কাছে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। বলেছেন, 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গল আলোক/তবে তাই হোক।' গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন—'মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/তবে তাই হোক।'

রবীন্দ্রসংগীতে যেমন মৃত্যু একটা মস্ত বড় theme, প্রেমও তেমনি। মৃত্যু ঘটায় বিচ্ছেদ, প্রেম মিলন। মৃত্যু যে মুহূর্তে এল, সে মুহূর্তেই সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল। কিন্তু মজার কথা এই যে, দুই প্রেমিক যখন প্রেমাসক্ত হল তখন তাদের সঙ্গেও সংসারের বিচ্ছেদ ঘটল। দুজন একে অন্যকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' (একজন ইংরেজ লেখক একে বলেছেন— married alive)। অপর দিকে আবার এই যে মৃত্যুর কথা এবং প্রেমের কথা এত করে বলেছেন তাতেই মিলনে বিচ্ছেদে বেদনায় রচিত হয়েছে জীবনসংগীত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্যে বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। বৈষ্ণব কবিরা স্বর্গীয় প্রেম এবং পার্থিব প্রেমকে মিশিয়ে ফেলেছেন—দেবতাকে প্রিয় করেছেন, প্রিয়কে দেবতা। রবীন্দ্রসংগীতেও পূজা পর্যায় এবং প্রেম পর্যায়ের গানে বৈষম্য সব সময়ে খুব সুস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রকাব্যের উপরে উপনিষদের প্রভাব নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু বলেছেন তাঁর কাব্যে উপনিষদ যতখানি, বৈষ্ণব পদাবলী ততখানি। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে প্রেমের আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বহু প্রেমের গানে প্রণয়ের সেই ধরনটি স্পষ্টত ধরা পড়েছে। 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে', 'হৃদয়ের একূল ওকূল দু কূল ভেসে যায়', 'আমার মন মানে না, দিন রজনী', 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে' বা 'একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে'—বহু সংখ্যক গানের মধ্যে ক'টি মাত্র উল্লেখ করা গেল। ভাবে এবং ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এ সব গানের সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট।

ভগবৎ প্রেম, মানবিক প্রেমের পরেই এসে যায় স্বদেশ প্রেমের কথা। এখানেও তিনি অতুলনীয়, এতখানি আর কেউ দেননি। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের জাতীয় সংগীতটি রবীন্দ্রনাথের রচিত। এ ছাড়া 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা' কিংবা 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'—এ সব গানও জাতীয় সংগীত হবার যোগ্যতা রাখে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদা একটি গোটা রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল রবীন্দ্রসংগীত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের চারণ কবি। কত যে গান রচনা

করেছিলেন ! বাংলা দেশের চিত্ত মন্থন করে সে গানের জন্ম । সে সব গানের সুরও বঙ্গদেশের মৃত্তিকা থেকে উত্থিত—কোনটি কীর্তনের সুরে, কোনটি রামপ্রসাদী, কোনটি বাউল সুরে, কোনটি ভাটিয়াল রাগিণীতে। লোকের হাতে অস্ত্র ছিল না, কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রসংগীত। সমস্ত দেশ এক ভাবের বন্যায় মেতে উঠেছিল। সে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়েছিল ইংরেজের রাজদম্ভ, রাজদণ্ড।

অনেক কথা বলা হল, তথাপি সব কথা বলা হয়নি। এযাবৎ যা বলেছি তা হল, কবির দৃশ্যমান জীবনটি কিভাবে তাঁর সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে সেই কথা। কিন্তু যেখানে মানুষটি চক্ষুর অগোচর, যেখানে তিনি একান্ত একাকী, অতি নিবিড়ভাবে নিঃসঙ্গ সেখানে একমাত্র সঙ্গী তাঁর জীবনদেবতা। তাঁর সঙ্গেই ভাবের আদান-প্রদান। এরই নাম সাধনা—ফল সাধনালব্ধ জ্ঞান, সহজ কথায় সুগভীর উপলব্ধি। যে প্রজ্ঞার অধিকারী হিসাবে কবিকে বলা হয়েছে দ্রষ্টা বা ঋষি, রবীন্দ্রনাথ যে সে প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তারও প্রমাণ আছে রবীন্দ্রসংগীতে।

কবির যা কিছু দান তার সমস্তই তাঁর সৃজনশীল মনের দান। সৃজনীশক্তি মানুষের জন্মগত গুণ নয়। যে মানুষ যে জীবনযাপন করেন, যে পরিবেশে বাস করেন, জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলীকে যেভাবে গ্রহণ করেন—তারই সম্মিলিত প্রেরণায় সৃজনীশক্তি উদ্দীপিত হয়। এক সময়ে ছাত্র-শিক্ষক আশ্রমবাসীদের জন্য শান্তিনিকেতনের জীবনটিকে মনের মতো করে গড়ে তোলবার জন্যে কবি মনপ্রাণ ঢেলে দিবারাত্রি ভেবেছেন, কাজ করেছেন। সেই শান্তিনিকেতনকে তিনি যতখানি গড়েছেন, শান্তিনিকেতন আবার তাঁকে ততখানি গড়েছে। এর আভাস আগেই দিয়েছি। অপর দিকে আবার যত শোক তাপ, দুঃখ আঘাত পেয়েছেন তাও হৃদয় মথিত করে বহুতর সৃষ্টির উপাদান যুগিয়েছে। বলেছেন—'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কি তোমার চাই।' এরও উল্লেখ করেছি আগে। কিন্তু দুঃখের আঘাত তাঁকে ভূপাতিত করতে পারেনি, দুর্যোগের বাত্যা তাঁর অন্তরের আলোকে নির্বাপিত করতে পারেনি। বলেছেন—'পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই।' লক্ষ করবার বিষয় যে গানটি পূজা পর্যায়ের নয়, প্রেম পর্যায়ের। বিধাতাকে দেখেছেন প্রেমিক হিসাবে। তিনি যে দুঃখ দেন তাও ভালোবাসার দান। দু পক্ষই ভিখারি। আমরা তাঁর কাছে হাত পেতে আছি, তিনিও নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন।

একদিকে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলবার রোমাঞ্চ, অপর দিকে পারিবারিক নানা দুর্বিপাকের ঝঞ্ঝা—দু'-এর ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর সৃজনীপ্রতিভা বিশেষ এক উদ্দীপনা লাভ করেছিল। শুধু পরিবারে নয়, বিদ্যালয়েও অঘটন ঘটেছে। পুত্রসম অধ্যাপক সতীশ রায়কে, বন্ধুপ্রতিম মোহিত সেনকে হারিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে দশ বারোটি বছর এক বিষম বিঘ্নসঙ্কুল কাল। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় যে ওই দ্বাদশ বৎসরকাল বোধ করি রবীন্দ্রজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল অধ্যায়। ওই সময়ের মধ্যে তিনি পঞ্চাশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক নতুন জীবনের সূত্রপাত হল। সেই শুভ মুহূর্তেই বলা যেতে পারত—'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।'

বলা বাহুল্য, জীবনের পরীক্ষা সেখানেই শেষ হয়নি। এক সময়ে বলেছিলেন—'আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে।' ছিল বৈকি। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হয়েছে এর পরে। আগাগোড়া লক্ষ করা গিয়েছে, মনের প্রশান্তি কোন মতেই বিনষ্ট হতে দেননি। গভীরতম দুঃখের মধ্যেও বলেছেন—'তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা।' কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের শেষকৃত্য সমাপ্ত করে ফিরছেন মজঃফরপুর থেকে। জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী—চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, চারদিকে উপচে পড়ছে। ভাবছেন, আমার হৃদয় শূন্য হলে কি হবে, কোথাও তো এতটুকু কমতি, এতটুকু অপূর্ণতা নেই। সমস্তই যেখানে পূর্ণ সেখানে আমার হৃদয় শূন্য থাকবে কেন ? আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আপন অধিকারে, সেখানেই শক্তির উৎস। সে শক্তিবলেই বলতে পেরেছেন—'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা/বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' এ শুধু মুখের কথা নয়, এ জিনিস উপলব্ধিজাত, সাধনালব্ধ। আরো বলেছেন, দুঃখ থেকে আমাকে রক্ষা করতে হবে না, দুঃখকে যেন জয় করতে পারি সেই শক্তি আমাকে দাও। জীবনে যে সুখটুক পেয়েছেন সেইটুকুই সার্থক, দুঃখটা নিরর্থক এমন কথা কখনো ভাবেননি বা বলেননি। সুখ দুখ দুটি ভাই, মিলে মিশে থাকে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে পাওয়া যায় না।

সকল মানুষের জীবনেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে যায়—যা চায় তা পায় না, যা পায় তা চায় না। জীবনের হাতে আছে নানা ছলাকলা, প্রলোভন প্রবঞ্চনা। ছলনায় ভুলে সকলকেই কিছু না-কিছু নাকাল হতে হয়। সেজন্য সদা সতর্ক থেকেছেন। বলেছেন—'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।' এই যে অত্যাশ্চর্য এই ধরণীর কোলে স্থান পেয়েছেন—বলছেন, এটাই এত বড় একটা পাওয়া যে ছোটখাটো না-পাওয়ার দুঃখ আর মনকে কোন পীড়া দিতে পারে না। মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে একটু-আধটু বেদনার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সে বেদনাও পরে এক সময়ে রসে পরিণত হয়। বলেছেন—'নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে/বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।'

এই সঙ্গেই আরেকটি গানের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে— 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।' সংসারী মানুষরা বেশির ভাগই অতি সাবধানী, অতি হিসেবী মানুষ; তারা কিছুতেই ঠকতে চায় না ; পাছে কোথাও কোন কিছুতে লোকশান ঘটে, সেই ভয়ে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকে। কিন্তু খুব সাবধানী মানুষকেও শেষ পর্যন্ত সেই ঠকতেই হয়, তবে কিনা যথেষ্ট আড়ম্বর করে ঠকে। কবি বলছেন, অত ভাবনা চিন্তা না করে আপন অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাও নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পথের প্রান্তে মহামূল্য ধন কিছু হয়তো পেয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ হিসেবী মন নিয়ে, লাভ ক্ষতির কথা ভেবে কোন কাজ করেননি। নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ টাকা একটি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। আত্মীয় বন্ধুরা বাধা দিয়েছিলেন, তিনি কারো কথায় কর্ণপাত করেননি। কাজটি করেছিলেন নিজ জমিদারিতে প্রজাদের হিতকল্পে— মহাজনের কাছে না গিয়ে ওই ব্যাঙ্ক থেকেই যাতে অল্প সুদে টাকা ধার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আট বছর পরে ব্যাঙ্কটি উঠে যায়, টাকাটা মারা পড়ে। তাই নিয়ে কোন দিন কিছুমাত্র হাহুতাশ করেননি। বলতেন ওই ক'টি বছর তো টাকাটা ওদের কাজে লেগেছে। এই ভেবেই তিনি মনে যথেষ্ট তৃপ্তি

লাভ করেছেন। গানের শেষ লাইনটিতে সাধে বলেছেন—'সব-হারাবার জয়মালা পর শিরে।'

রবীন্দ্রনাথের এমন যে জীবন—আপাত দৃষ্টিতে কানায় কানায় পূর্ণ; কিন্তু সে জীবনে অপূর্ণতা কিছু ছিল না এমন নয়। যে জিনিস যেমনটি হবে ভেবেছিলেন তেমনটি হয়নি; অনেক ক্ষেত্রে আশায় নিরাশ হয়েছেন। অবশ্য আগেই বলে নিয়েছেন, কি পেয়েছেন আর কি পাননি তার হিসেব কবতে যাবেন না। তাহলেও নানাভাবে যে বঞ্চিত হয়েছেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেজন্যে মনকে বেঁধেছেন শক্ত করে, পণ করেছেন অতি সুকঠিন। বলেছেন—'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।' ভাগ্যিস বঞ্চিত হয়েছি, তাই বেঁচে গিয়েছি—এমন কথা সংসারে ক'জন লোক বলতে পারেন? এখানেই সুগভীর জ্ঞানের পরিচয়। মনের সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষাই যদি পূর্ণ হত তাহলে অতি প্রশ্রয়ে জীবনটা উত্থান-পতন-রহিত একেবারেই সমতল হয়ে যেত। সমতল হয়ে যাওয়া আর সাধারণ হয়ে যাওয়া এক কথা। রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি অসাধারণ পুরুষ এ গানটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলেছেন, বিধাতার কাছ থেকে অযাচিতভাবে যা পেয়েছেন তার জন্যে তাঁকে যোগ্য করে নেবার জন্যেই অন্যদিকে তাঁকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বলছেন—'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—আকাশ আলোক তণু মন প্রাণ/দিনে দিনে তুমি নিয়েছ আমায় সে মহাদানের যোগ্য ক'রে/ অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।' না-পাওয়ার দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু তাই নিয়ে মনে কোন নালিশ রাখেননি। বলছেন—'পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি দু'হাত মেলি।'

জীবনবিধাতার কাছে একান্তভাবে আত্মনিবেদন করতে জানতেন। এক সময়ে তাঁকে বলেছেন জীবনদেবতা। বলেছেন, দেবতার কোন অভিপ্রায় আছে, আমাকে দিয়ে তিনি সে অভিপ্রায় পূরণ করবেন। আমি তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। পরে গানের মাধ্যমে এ কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন—'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।' বলেছেন—'তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা/নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।' বক্তব্য শেষ করবার আগে এ প্রসঙ্গটিতে আবার ফিরে আসব।

কত দুর্যোগ ঘটেছে শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বে। কিন্তু দিশেহারা হননি। চিঠিতে লিখছেন, বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ ডুবে আছি। শান্তিনিকেতনের জীবনটিকে মন্থন করে ছাত্র-অধ্যাপক আশ্রমবাসীর মধ্যে অকাতরে আনন্দরূপ অমৃত বিতরণ করেছেন। দুর্যোগের বিষ নীলকণ্ঠের ন্যায় আপন কণ্ঠে ধারণ করেছেন। আশ্চর্য রকম আত্মস্থ তাঁর মন। বলেছেন—'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' এত যে দুঃখ তাপ সমস্তই নীরবে বহন করেছেন। নিজেই বলেছেন, আমার মধ্যে বোধ করি কোথাও একটা নির্মমতা আছে। তিনি যাকে নির্মমতা বলছেন, আমি তাকে বলি চরিত্রের অত্যাশ্চর্য দৃঢ়তা। ব্যক্তিত্বের মহিমা হিমালয় শিখরের ন্যায় অভ্রভেদী, মনোবল পর্বত গাত্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য।

শত রকমের কাজকর্মের মধ্যেও মনের সুগভীর স্তরে একটা আত্ম-জিজ্ঞাসা, নিজের মনে বোঝা-পড়ার পালা চলেছে নিরন্তর। এই মাত্র যে ক'টি গানের উল্লেখ করেছি তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে আত্ম-সমাহিত এক অপূর্ব পুরুষ, তাঁর আত্মপ্রকাশ

ঘটেছে। এ সব গান যে তাঁর গভীরতম উপলব্ধির ফল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ— জীবনসায়াহ্নে এ সব গানের কথা তাঁর মনে আনাগোনা করছে। অশক্ত দেহ, ধরে ধরে এনে বারান্দায় বসানো হয়েছে। পাশে আছেন রানী চন্দ এবং আরো দু'চারজন। হঠাৎ বললেন, সেই গানটা একবার বল তো রে—'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।' সবাই বিপদে পড়লেন, দু'এক লাইনের বেশি কেউ বলতে পারলেন না। ক্ষীণ হেসে বললেন, তোরাও দেখছি আমারই মতো। আমার গানের 'কথা' আমার মনে থাকে না। ছুটে গিয়ে বই এনে গানটা তাঁকে পড়ে শোনানো হল।

ওই যে 'বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে' গানটির কথা বলেছি সেটির কথা মনে হয় জীবনের শেষ মুহূর্তেও ভেবেছেন। একদা যাকে শখ করে বলেছিলেন জীবনদেবতা, জীবনের শেষ কাব্যে তাকে বলছেন ছলনাময়ী—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে, হে ছলনাময়ী।' মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কবি এখন সত্যের খুব কাছাকাছি। তাই বলে জীবনের নিন্দা করছেন না, জীবনের বন্দনাই গাইছেন। নারীকে বলা হয়েছে ছলনাময়ী, সে কি নিন্দার কথা? নারী যদি ছলনাময়ী না হত, তাহলে সে ভালোবাসার অযোগ্য হত। ছলনাময়ী নারী হয়েছে মোহিনী মায়ায় অপরূপা। জীবনও তেমনি। বহু বাসনায় প্রাণপণে চেয়ে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে। রোমাঞ্চ এই কারণে যে সেখানেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। বলেছেন, 'এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।' জীবনের শেষ বাক্যে জীবনের চরম সত্য উচ্চারিত হয়েছে—'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

রবীন্দ্রসংগীতের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রজগতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা গেল। অবশ্য এ কথা কেউ যেন না ভাবেন যে, রবীন্দ্রসংগীতের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মননশীল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোথাও ঢাকা থাকে না। তিনি স্বপ্রকাশ। অগণিত প্রবন্ধে, মন্দিরের ভাষণে,চিঠিপত্রে তো বটেই, এমন কি গল্পে উপন্যাসে নাটকেও তাঁর ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। এ সবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, স্বদেশচিন্তা, শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য চিন্তা সমস্তই সমভাবে বিদ্যমান। তবে এ কথা বলব যে, রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রজীবনদর্শন যতখানি Concentrated বা কেন্দ্রীভূত হয়ে ধরা দিয়েছে এমন আর কোথাও নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে গীতবিতানই রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ Commentary বা টীকা গ্রন্থ।

সংগীত সাহিত্য রসিকেষু

রবীন্দ্র-সংগীত এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের যাঁরা সবিশেষ অনুরাগী তাঁদের কাছে দুটি একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি। আশা করছি তাঁরা কথা ক'টি একটু ভেবে দেখবেন। সংগীতের কথাটাই আগে বলি। দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয়তার দিক থেকে রবীন্দ্র-সংগীত ইদানীং রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি অবশ্য এ দুটিকে আলাদা করে দেখি না। রবীন্দ্র-সংগীত একাধারে সংগীত এবং সাহিত্য। আমার মতে গীতবিতান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে তাঁর সংগীতকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। বলেছেন, আমার আর সব কিছু যদি লোকে ভুলেও যায় তাহলেও আমার গানের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। বলেছিলেন—তোমাদের সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়, উৎসবে ব্যসনে, সকল প্রয়োজনে গান বেঁধে দিয়েছি ; গ্রীষ্মের দহনে, বর্ষার বর্ষণে, শরতের সোনার কিরণে. বসন্তের "ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান/যে গানে মোর জড়ানো প্রীতি, সে গানে মোর রহুক স্মৃতি/আর যা সব হউক অবসান।" তাঁর গানকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন, এ কথাতেই তার প্রমাণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় বাঙালি সমাজে তাঁর গানের সমাদর দেখে যাননি, বরং অনাদরই দেখে গিয়েছেন। অতি স্বল্প পরিসর একটি অনুরাগী মহলে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা ছিল, তার বাইরে শিক্ষিত সমাজেও বড় একটা শোনা যেত না। মনে দুঃখ ছিল তবু জোর গলাতেই বলেছেন, আজ গাইছে না, কিন্তু একদিন গাইতে হবে। আমার এ গান বাঙালি না গেয়ে পারবে না। আমি তার মনের সকল তারে সুর বেঁধে দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ রেডিও টি ভি-তে সারা দিনমান রবীন্দ্র-সংগীত, কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলে অসংখ্য রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিনিয়ত রবীন্দ্র-সংগীত এবং নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান। চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে ; কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বল শহরে, শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ সবের কিছুই দেখে যাননি। তাঁর জীবদ্দশায় রেডিওতে সপ্তাহে বোধকরি রবীন্দ্র-সংগীতের একটি দুটি সিটিং হত লাইট মিউজিক বা লঘু সংগীতের পর্যায়ে। রবীন্দ্র-সংগীত নামটাই তখনো সৃষ্টি হয়নি ; লোকে বলত রবি ঠাকুরের গান। আজ যে রবীন্দ্র-সংগীতের জয়জয়কার তার সমস্তটাই পসথুমাস্। সাধে কি ইংরেজ লেখক বলেছিলেন—অল্ গ্রেটনেস ইজ পস্থুমাস্। যাহোক এ বিষয়ে এখন সন্দেহমাত্র নেই যে আজ রবীন্দ্র-প্রচারের

সর্বোত্তম মাধ্যম হয়েছে রবীন্দ্র-সংগীত।

প্রত্যেক দেশের একটি নিজস্ব ক্লাইমেট বা জল-হাওয়ার আস্তরণ আছে; দেশবাসীর জীবনযাত্রা তার দ্বারা প্রভাবিত। তেমনি আবার প্রত্যেক জাতির মনেরও একটা ক্লাইমেট আছে; জাতির শিল্প সাহিত্য সংগীত ওই মনোজাত ক্লাইমেট থেকে উদ্ভুত। সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, নানা অনুভব অনুভূতি নিয়ে বাঙালি মনে যে একটি স্বভাব-সৃষ্ট পরিবেশ নিত্য ক্রিয়াশীল সেটি রবীন্দ্রনাথের গানে যেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কিছুতেই নয়। সেজন্যেই গীতবিতানকে বলেছি বাঙালির মহাকাব্য। যাহোক আমি এখানে রবীন্দ্র-সংগীতের কাব্যিক বা সাহিত্যিক গুণাবলীর আলোচনা করতে বসিনি। সংগীতজ্ঞ নই, কাজেই সাংগীতিক আলোচনাও আমার উদ্দেশ্য নয়। যে সমস্যাটির উল্লেখ করতে যাচ্ছি সেটিকে বরঞ্চ বলব বৈষয়িক বা সাংসারিক। কাব্যে শিল্পেও বৈষয়িক দিকটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। সহৃদয় পাঠকরা বিষয়টি ভেবে দেখলে বাধিত হব।

রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যাটা বলতেও লোকে খুব ঢিলেঢালাভাবে বলে—দু হাজার আড়াই হাজার হবে। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটা দু হাজারের কিছু কম। তিনি একাধারে গীতিকার এবং সুরকার, নিজের গানের সুর নিজেই দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কিছু গান থেকে গিয়েছে যার সুর দেওয়া নেই কিংবা দেওয়া সুরটা পাওয়া যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনা এবং সুর যোজনা সম্পর্কে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁদের মুখে শুনেছি তিনি গুন-গুন সুরে সুরে ভাঁজতে ভাঁজতেই গানের পদ রচনা করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কথা এবং সুর একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। অবশ্য গানটি আগে রচিত হয়েছে, পরে তাতে সুর যোজনা করা হয়েছে এমন কখনো ঘটেনি, এ কথা কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। এমন কিছু দৃষ্টান্ত তো আমাদের জানাই আছে যা প্রথমে কবিতা হিসাবেই লেখা হয়েছিল, পরে তিনি তাতে সুর আরোপ করেছেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন যে তিনি সুর ভুলে যেতেন, সেজন্যে গান এবং সুর রচনা শেষ হওয়া মাত্রই কাউকে ডেকে সুরটি তার গলায় তুলে দিতেন। সুরবিহীন যে গানগুলোর কথা বলছিলাম সে সম্বন্ধে এরূপ ভাবা অসঙ্গত নয় যে যেসব গানেও তিনি সুর দিয়েছিলেন কিন্তু সে সুর তিনি কারো গলায় গচ্ছিত রেখে যেতে পারেননি। সুর সংযোগ হলে তবে সংগীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সুরলোকে উন্নীত হয়নি বলে ওদের দুর্লভ সংগীত জন্ম ব্যর্থ হতে চলেছে, কারণ এ সব গান আজ পর্যন্ত গাওয়া হয়নি।

সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তবে খোঁজ খবর নিয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি এরূপ গানের সংখ্যা দেড় শতেরও কিছু বেশি হবে। ভাবলে খুব অবাক লাগে যে রবীন্দ্র-সংগীতের যেখানে আজ এত সমাদর সেখানে রবীন্দ্রনাথের এতগুলো গান অনাদরে অব্যবহারে পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী বলতে এখন বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে থাকেন যে এসব গান চিরকাল এ ভাবেই পড়ে থাকবে তাহলে তাঁরা মস্ত বড় ভুল করবেন। রবীন্দ্রনাথের কপি-রাইট-এর আয়ু আর দশ বছরও নয়। কয়েক বছর পরে যেকোন ব্যক্তি ওসব গানে সুর আরোপ করতে পারবেন। সেটা রবীন্দ্র-সংগীত না হয়ে আধুনিক সংগীতেও পরিণত হতে পারে। সকলেই জানেন যে নিজের গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের খুব একটু

খুঁতখুঁতুনি ছিল। বলতেন, দেখো, আমার গানটা যেন আমার বলে চেনা যায়। এই চেনা যাওয়ার উপায়টা হল রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষ একটা ঢং বা স্টাইল। প্রত্যেকটি গানের একটি ভাবমূর্তি আছে। ওই ভাবটির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে গানটিতে সুর যোজনা করা হয়েছে। যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছেন, তাঁর গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা করে আসছেন, রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষকতা করেছেন এবং রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন, আশা করা যেতে পারে, যে তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের স্বভাব ধর্ম, ধরন ধারণ, উচ্চারণ ভঙ্গি, ধাঁচ বা ঢং অনেকাংশে আয়ত্ত করেছেন। রবীন্দ্র-সংগীতের এই যে সব বৈশিষ্ট্য—সব মিলিয়ে একে একটা ঘরানা বলা চলে। নন্দলালের নেতৃত্বে যেমন একটি শান্তিনিকেতন স্কুল অব পেন্টিং-এর সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি রবীন্দ্র-সংগীতকে অবলম্বন করে একটি শান্তিনিকেতন স্কুল অব মিউজিকও গড়ে উঠেছে। এই শান্তিনিকেতন ঘরানাটিকে যাঁরা মোটামুটি আয়ত্ত করেছেন তাঁদের পক্ষে ওই সুরবিহীন গানগুলোতে সুর আরোপ করাটা কি নিতান্তই একটা অসম্ভব কাজ বলে কেউ মনে করেন ? প্রশ্ন উঠতে পারে এ কাজে উদ্যোগী হবেন কে ? যিনি উত্তরাধিকারী, সম্পত্তি রক্ষার দায় দায়িত্ব তাঁর। কাজেই উদ্যোগী হতে হবে বিশ্বভারতীকেই।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গানের তালিম নিয়েছেন, আজীবন রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চায় এবং শিক্ষাদানে নিবত ছিলেন এমন কয়েকজন এখনো জীবিত এবং কর্মক্ষম আছেন। আমি মনে করি কাল বিলম্ব না করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উচিত এঁদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা। প্রয়োজন বোধে দু একজন সুদক্ষ রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি ওই অপ্রচলিত গান সমহের প্রত্যেকটিতে সুর যোজনা করবেন এবং তার স্বরলিপি করে দেবেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ওই স্বরলিপিকেই authorized version হিসাবে প্রচার করবেন। এ কাজটিতে আদৌ বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ফেলে রাখলে অপব্যবহারের আশংকা আছে, সে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্র রচনাবলীব ব্যাপারে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেসব জিনিস বরবাদ করে দিয়েছিলেন তাও অচলিত সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের চোখে কোন জিনিসই ফেলনা নয়। বিশেষ করে গানের বেলায় রবীন্দ্রনাথ কোনও গান কখনো বরবাদ করেছেন এমন কথা শোনা যায়নি। তাঁর সব চাইতে আদরের বস্তু যে গান তারই এত বড় একটা অংশ এতকাল অনাদরে পড়ে আছে, এটা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের পক্ষেও গৌরবের কথা নয়, রবীন্দ্র-সংগীত বিশারদদের পক্ষেও নয়। আরেকটি কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। পুরোনো যেটুকু হাতে আছে সেটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই বিশ্বভারতীর কর্তব্য সমাপ্ত হবে না। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই হয় না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ত সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকবে। আমার প্রস্তাবিত কাজটি সম্পন্ন হলেও বলা যাবে যে কিছু অন্তত creative কাজ হয়েছে।

আমার অপর প্রস্তাবটি সাহিত্য-রসিকদের দরবারে পেশ করছি। আশা করছি তাঁরা বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নামক উপন্যাসটি সম্পর্কে। সকলেই জানেন যে উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়

(১৯৩৪ সালে) তখন কাহিনীর আভাস হিসাবে গ্রন্থের মূল আখ্যানটির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন। ভূমিকাটিকে বলা চলে উপাধ্যায় উপাখ্যান। রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একে অন্যের গুণমুগ্ধ অকৃত্রিম সুহৃদ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রধান সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব। শান্তিনিকেতনে অতি অল্পদিনেরই অবস্থান। প্রচণ্ড এক প্রাণশক্তির তাড়না নিরন্তর তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে উড়িয়ে নিয়েছে। চলে গিয়েছেন বিলেতে। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সভ্যতার প্রচারে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ লণ্ডনে। দেশে ফিরে এসে দেখেন বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে দেশের আবহাওয়া বিদ্যুৎগর্ভ। ব্রহ্মবান্ধব অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে। তেজে বীর্যে চরিত্রে এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ওই আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায়। দুই বন্ধু আবার একই রণাঙ্গনে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত বাঙালি হৃদয়কে মথিত করেছে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে দিনের পর দিন অনল বর্ষণ করেছে। বাংলার অগ্নিযুগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সারা দেশে তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন এবং বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম একই লগ্নে। একটি প্রকাশ্যে পরিচালিত, অপরটি গভীর গোপনে পরিকল্পিত। রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনেই রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন গঠনমূলক পথে না গিয়ে নিছক উত্তেজনা উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়েছে দেখে তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে বিপ্লবী-যুবকেরা যখন সক্রিয় হয়ে উঠলেন ক্ষণে ক্ষণে বোমা বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল, ছেলেরা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে লাগল তখন রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এঁদের দুর্জয় সাহসে এবং অপূর্ব আত্মবলিদানে বিস্মিত বিমুগ্ধ অপরপক্ষে আবার এমন সব ছেলের প্রাণ বিসর্জনে বিষাদগ্রস্ত। তাঁর লেখায় এঁদের সম্বন্ধে অকুণ্ঠ স্তুতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে ; তাহলেও সন্ত্রাসবাদ ব্যাপারটাতে তাঁর মনের সায় ছিল না। এইসব নির্ভীক আদর্শ-চরিত্র ছেলেদের অকালমৃত্যু দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে জিনিসের শুরু হয়েছিল, তিরিশের দশক অবধি তা অবিরাম চলতে লাগল। কত ছেলের, কত মেয়ের জীবন যৌবন অকালে শেষ হল রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে যতখানি গর্ব অনুভব করেছেন ততখানি বেদনাও অনুভব করেছেন। 'চার অধ্যায়' গ্রন্থে অন্তু এলার কাহিনীটি ওই বেদনা থেকে উদ্ভূত। স্পষ্টতই দেখা যাবে এদের দু'জনের প্রতিই লেখকের গভীর মমতা। বলতে চেয়েছেন, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে থেকে এরা আপন স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তারই ফলে এদের জীবনের ট্র্যাজেডি। এমন সুগভীর প্রেমও যথার্থ চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত হল। এই বেদনাময় কাহিনীটির সূচনায় উপাধ্যায় উপাখ্যানটিকে রবীন্দ্রনাথ উপক্রমণিকা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে এসে আপন কাজে মগ্ন, ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন কলকাতায়, ব্রহ্মবান্ধব হঠাৎ এসে হাজির। বোধকরি বছর দেড় দুই-এর ব্যবধানে দু'জনের সাক্ষাৎ। সেই পুরোনো দিনের মতো দুই বন্ধুতে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। ধরেই নেওয়া যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা,

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথাও কিছু হয়ে থাকবে। আলোচনার শেষে ব্রহ্মবান্ধব বিদায় নিয়ে উঠলেন। দু পা গিয়ে চৌকাঠের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই শেষ কথা ; দুই বন্ধুতে আর সাক্ষাৎ হয়নি। এর অনতিকাল পরেই রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রহ্মবান্ধব বন্দী হলেন। মামলা চলাকালে বন্দী অবস্থাতেই মৃত্যু।

এদিকে 'চার অধ্যায়' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনীর আভাস বা ভূমিকাটিকে কেন্দ্র করে একটা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হল। বিশেষ করে যাঁরা এক কালের সশস্ত্র বিপ্লবী, দীর্ঘকাল কারাবাসে থেকে দুঃখ ক্লেশ সহ্য করেছেন এবং অন্যান্য যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাঁরা ওই ভূমিকাটিতে ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক নন তা এই গ্রন্থের মূল কাহিনীটিতেই স্পষ্টত প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সমালোচকদের প্রধান আপত্তি ছিল যে তিনি নিজ মতের সমর্থনে ব্রহ্মবান্ধবকে সাক্ষী মেনেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, ব্রহ্মবান্ধব জীবিত নেই, তিনি কি অর্থে ওই কথাটি—'আমার খুব পতন হয়েছে' —বলেছিলেন তা তিনিই বলতে পারেন। তাঁর অবর্তমানে ওই কথাটির উল্লেখ করাটা খুব ন্যায্য হয়নি ; এতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব নিজ রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন, ওই কথাটিতে এরূপ একটা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যাঁকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছিল আলোচনার গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় কি অর্থে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল তা বুঝবার ক্ষমতা কি তাঁর ছিল না ? যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে এই সামান্য বোধ বুদ্ধির অধিকারী বলে মনে করেন না, তাঁদের যুক্তি অকাট্য বলে গ্রহণ না করাই সঙ্গত। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা তাঁদের মনঃপূত ছিল না, তদুপরি মূল কাহিনীটিতে বিপ্লবীদের চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রণালী রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেনি ; এ কারণেই তাঁরা রুষ্ট হয়েছিলেন। পত্র পত্রিকায় কটু এবং কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছে, তাঁরা বইটিকে অন্তু এলার প্রেম কাহিনী হিসাবে দেখেননি অর্থাৎ সাহিত্য হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন একটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে। তাতে বইটির প্রতি অবশ্যই কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয়েছিল। তাহলেও বলব ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে ঝগড়া চলে না। পছন্দ অপছন্দ যার যার মনের ব্যাপার। আমার ভালো লাগার যতখানি অধিকার, অপরের ভালো না লাগার ঠিক ততখানিই অধিকার। সেজন্যে সেদিন যাঁরা 'চার অধ্যায়' এর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাইনি, আজও করতে চাই না।

ঝগড়া তাঁদের সঙ্গে নয়, ঝগড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। আগে বলে নেওয়া ভালো যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই ওই সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। প্রবাসীতে (বৈশাখ, ১৩৪২) 'কৈফিয়ৎ' নামে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। জবাব দেবার খুব একটা প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু খুব বিচিত্র এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে কয়েক মাস পরেই 'চার অধ্যায়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল ভূমিকাটি তাতে নেই অর্থাৎ সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ কি এমন ঘটল যে নিজের কথা নিজেকেই গিলতে হল! সমালোচনার বহর দেখে কি তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ? বিশ্বাস করা কঠিন। সেই যৌবনকাল থেকে এত কটু সমালোচনা শুনে

এসেছেন যে সেসব তাঁর গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। 'চার অধ্যায়'-এর বেলায় সে কারণে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর বছর কুড়ি আগে (১৩২২ সালে) 'ঘরে বাইরে' যখন সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন ওই কাহিনীতে সন্দীপের একটি উক্তিতে সীতার অবমাননা হয়েছে বলে প্রবল উত্তেজনা এবং ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। নানা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ সে বারেও তাঁর কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, সেটি সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে 'ঘরে বাইরে' যখন গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় তখন সেই উক্তিটি তিনি প্রত্যাহার করেননি এবং পরবর্তী কোন সংস্করণেও তা বাদ পড়েনি। আজ পর্যন্তও সেটি যথাস্থানে নিবদ্ধ আছে।

'চার অধ্যায়'-এর বেলায় পৃথক ফল কেন? বয়সের ভারে মন কি তাঁর দুর্বল হয়ে এসেছিল? 'ঘরে বাইরে' লিখেছেন বয়স যখন পঞ্চাশের কোঠায়; 'চার অধ্যায়' লিখেছেন সত্তরের কোঠায় এসে। কিন্তু মনের বা মস্তিষ্কের ক্ষমতায় যে বিন্দুমাত্র ভাঙচুর ঘটেনি চার অধ্যায়-এর গল্পটিই তার প্রমাণ। কাহিনীর এমন ঘন-পিনদ্ধ কায়া, ঘটনার এমন ক্ষিপ্রগতি, ভাষার এমন ক্ষুরধার দীপ্তি, চরিত্র চিত্রনে এমন অনায়াস নৈপুণ্য—সমস্তটা মিলিয়ে এমন জ্বলজ্বলে ঝলমলে গল্প আমাদের সাহিত্যে ক'টি আছে? তথাপি কয়েক মাসের মধ্যেই গল্পের মুখবন্ধটির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল, এটি রীতিমত রহস্যজনক বলতে হবে। তবে রহস্যটা খুব একটা দুর্ভেদ্য রহস্য নয়; বরং যতটুকু ভেবে দেখেছি তাতে রহস্যটি একটু হাস্যকরই মনে হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'-র যুগে রবীন্দ্রনাথের কোন 'অভিভাবক' ছিল না। যা করেছেন নিজ বুদ্ধিতেই করেছেন। সত্তরের কোঠায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেক খানি হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর চারদিকে যথেষ্ট ভিড় জমে গিয়েছে। পার্শ্বচররা তাঁকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা সকলে মিলে তাঁর মঙ্গলামঙ্গলের ভার নিয়েছেন। তাঁদের মঙ্গল কামনা প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে পপুলার করবার প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথ মানুষটা কোন কালেই পপুলার ছিলেন না। পপুলারিটির প্রত্যাশীও তিনি ছিলেন না। তাঁর জীবন যাপন ধরন ধারণ মনন চিন্তন সমস্তই সাধারণের জীবন থেকে এতই ভিন্ন ধরনের যে, তিনি কোন মতেই জনপ্রিয় হতে পারেননি। ধর্মে সমাজে রাজনীতিতে কোন ব্যাপারেই জনতার সঙ্গে তো নয়ই, জননেতাদের সঙ্গেও কোন দিনই তাঁর মতের বা মনের মিল হয়নি। সে মানুষকে যখন লোকের মন জুগিয়ে চলবার পরামর্শ দেওয়া হয় তখন সেটা জবরদস্তি হয়ে দাঁড়ায়। জবরদস্তি যে এক-আধটু হয়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল এর বছর চারেক পরে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে যখন সুভাষচন্দ্রের বিরোধ চলছিল তখন রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল কলকাতায়, দিনক্ষণও স্থির হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি ওই উপলক্ষে রচিত। সভায় বিতরণের জন্য ভাষণটি মুদ্রিতও হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কবির অভিভাবকবৃন্দ স্থির করলেন যে গান্ধী ভক্তরা ক্রুদ্ধ হতে পারেন, অতএব ভাষণটি এভাবে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কলকাতায় প্রস্তাবিত সংবর্ধনা স্থগিত থাকল। পরে সুভাষচন্দ্র যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন কবি সেখানে তাঁকে সংবর্ধিত করেন সংক্ষিপ্ত

একটি মৌখিক ভাষণে। লিখিত ভাষণটি বেমালুম চেপে দেওয়া হল। কোন পত্র-পত্রিকায়ও সেটি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়নি। যুদ্ধ শেষে যখন আই এন এ-র স্রষ্টারূপে দেশময় নেতাজী সুভাষের জয় জয়কার, তখনই প্রথম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি লোকসমাজে প্রচারিত হল। রবীন্দ্রনাথ সুভাষ দুজনেই তখন গত। ভাবলে হাসি পায়, যিনি লিখেছিলেন তিনি লেখাটির প্রচার দেখে যাননি, যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল তিনি এর অস্তিত্বই জানতে পারেননি। এরূপ অবস্থায় অনুমান করা খুব অসঙ্গত নয় যে 'চার অধ্যায়'-এর বেলায়ও অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আপত্তি যখন উঠেছে তখন ভূমিকাটা বাদ দিলেই হয়, মিছি মিছি লোকের বিরাগভাজন হয়ে লাভ কি? পুরোনো দিনের অন্তত একজন আশ্রমিকের কাছে শুনেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অতিষ্ঠ হয়েই বলেছিলেন—ঠিক আছে, দাও বাদ দিয়ে। এ জাতীয় মতান্তরের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—'সঙ্ঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রত পালন করতে পারিনি।' এই ব্রতটি হল, গোড়ার দিকের কিছু কিছু লেখা তাঁর রচনা-সংগ্রহ থেকে বাদ দেওয়া। দেখা যাচ্ছে লেখা বাতিল করার ব্যাপারে দোষটা উভয় পক্ষের—উপদেষ্টাদের যতখানি রবীন্দ্রনাথেরও ততখানি। রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি রচনাবলী থেকে কিছু জিনিস একেবারে বরবাদ করে দিতে চেয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছেন। অমান্য করে খুব ভালো করেছেন বলতে হবে, নতুবা পাঠক সমাজ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস থেকে বঞ্চিত হতেন। আমি পূর্বে কবির স্ব-নিযুক্ত অভিভাবকদের যেমন অভিযুক্ত করেছি, এ ক্ষেত্রে তেমনি আবার তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লেখক নিজেই নিজের লেখার সব চাইতে বড় সমজদার এমন কথা জোর করে বলা চলে না। সাহিত্যের উপরে লেখক বা পাঠক কারোই জবরদস্তি খাটে না। 'চার অধ্যায়'-এর ভূমিকাটি বাতিল করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যদি স্বেচ্ছায় মত দিয়েও থাকেন, তাহলেও তা গ্রাহ্য নয়। সাহিত্য একমাত্র রসের বিচারকেই মানে, অন্য কোন নালিশ বা সালিসকে মানে না। তবে আমাদের দেশের দস্তুর আলাদা। আমাদের সমাজ যেমন শুচিবাই গ্রস্ত, সাহিত্যও তেমনি। সমাজে একটুতেই লোকের জাত যায়, সমাজচ্যুত হয়।

সাহিত্যেও অনেক জিনিস অকারণে বরবাদ হয়ে যায়। আমরা ভুলে যাই যে, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিচারে কোন জিনিস অগ্রাহ্য মনে হলেও রসের বিচারে তা গ্রাহ্য হতে পারে। ব্রাউনিং-এর The Lost Leader নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে দলত্যাগী নেতার বর্ণনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে বলে বেশ কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কবি প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়েছিলেন, জনে জনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। কিন্তু কবিতাটি প্রত্যাহার করে নেবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। একটি অতি সুন্দর রসোত্তীর্ণ কবিতা হিসাবে ইংরেজি কাব্যের আসরে সেটি আজও স-সম্মানে বিরাজ করছে। আলোচ্য ভূমিকাটিতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করা তো দূরের কথা, তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। দুই মহামনস্বী ব্যক্তির সখ্য সহযোগিতা এবং ভাবের আদান-প্রদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটি তাতে আছে, অতি মূল্যবান সামগ্রী হিসাবে সর্বপ্রযত্নে সেটি রক্ষা করা উচিত। এছাড়া

অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যের নিদর্শন হিসাবেও ভূমিকাটি বিশেষ মর্যাদার দাবি করতে পারে। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, রচনাটি কোন মতেই 'অরক্ষণীয়া' নয়। এসব কারণে আমার বিনীত নিবেদন যে 'চার অধ্যায়'-এর পরবর্তী সংস্করণে ওই ভূমিকাটি পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হোক। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং সুরসিক পাঠক সমাজ প্রস্তাবটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখলে বাধিত হব। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, বিশ্বভারতী সংস্করণ রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডে গ্রন্থপরিচয় অংশে রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎ সহ ভূমিকাটি সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে। আমার মতে ওইটুকু যথেষ্ট নয়। মিউজিয়ামে রক্ষিত নিষ্প্রাণ পদার্থের ন্যায় কতিপয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করলেও রচনাটি সাহিত্যের প্রাণ আর ফিরে পাবে না ; অচলিত-সংগ্রহের সমতুল্য হয়ে থাকবে। অচলিত চিরকালই পতিত থাকবে। ভবিষ্যতের গবেষণাকারীরা অবশ্যই খুঁজে পেতে বের করবেন, উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখবেন। কিন্তু তাতেও লাভ কিছু হবে না। কারণ গবেষণার রাজ্যে প্রবেশের অর্থ, রসের রাজ্য থেকে নির্বাসন।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে রবীন্দ্র ভাবনা

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কথাটির মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, একদা বাঙালির জীবন ছিল বড় সুখের, বড় আনন্দের। সমাজ জীবনটি ছিল সংবৎসর আনন্দমুখর। অভাব অনটন ছিল, সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ছিল, কিন্তু এরই মধ্যে উৎসব পার্বণও লেগেই থাকত। ভোগ্য বস্তুর অভাবেও জীবন যে উপভোগ্য হতে পারে, এই মহা সত্যটি বাঙালি আবিষ্কার করেছিল। এখানেই বাঙালি কালচারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটিয়ে আনন্দের আয়োজনে জীবনযাত্রাকে যতটুকু শোভন সুন্দর করা যায় সেটুকুই হল জীবনের কাছ থেকে আমাদের বাড়তি পাওয়া, ওইটুকু উদ্বৃত্ত ; ওই উদ্বৃত্তের সন্ধান কোন্ সমাজ কতটুকু করেছে তাই দিয়েই তার কালচারের পরিচয়, পরিমাপ।

পার্থিব সম্পদকে বাদ দিয়েও যে জীবনকে সমৃদ্ধ করা যায় সে কঠিন পরীক্ষায় বাঙালি একদা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিল। বাংলার বাইরেও তা স্বীকৃতি পেয়েছিল। খুব দুঃখের কথা যে বাংলার সেই সুনামে আজ ভাটা পড়েছে। আমাদের আমোদ ফূর্তির মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা দিয়েছে। ইদানীং কালের দোল দুর্গোৎসব দেখলেও মনে হবে না, এটা খুব একটা উন্নত সমাজ। সব ব্যাপারেই মাত্রাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হয়। আনন্দ সব সময়েই সংযত সুসঙ্গত রুচিসম্মত। বেপরোয়া ফূর্তি আনন্দের বিকৃত রূপ। বিকার হামেশাই ঘটে, পুলিস ডাকতে হয়।

উৎসব পার্বণ সকল দেশেই লোক সংস্কৃতির পরিচায়ক। কবে কোন্ দূর অতীতে আমাদের পূজা পার্বণাদির সৃষ্টি হয়েছে সঠিক ভাবে বলা কঠিন। অবশ্য সকল উৎসবই প্রাচীনত্বের দাবি করে এমন নয়। এ যুগেও নতুন নতুন উৎসবের সৃষ্টি হচ্ছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে বাঙালি উৎসবপরায়ণ জাতি। শুধু তাই নয়, উৎসব সৃষ্টিতে সে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তার কোন কোন উৎসবে অভিনবত্ব আছে, বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। এই যে রবীন্দ্র জন্মোৎসব নিয়ে এ মুহূর্তে সারা দেশ মেতে উঠেছে, এ জিনিস একমাত্র বাঙালির পক্ষেই করা সম্ভব। পৃথিবীর কত দেশে কত মহাকবি কত মহৎ সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে, কই কোথাও তো এমনটি হতে দেখি না। আমাদের মতো তারা মাতামাতি করতে জানে না এমন নয়। খুব জানে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের হিরো, হয় কোন রাষ্ট্রনায়ক নতুবা কোন ধনকুবের না হয় তো সিনেমা তারকা। এখানেই মূল্যবোধের পরীক্ষা। বাঙালি সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ

হয়েছে। পূর্বোক্ত হিরোদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েও বাঙালি সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে কবিকে। একজন কবিকে নিয়ে নগরে নগরে, শহরে বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে—এমন দেশব্যাপী উৎসব কোন দেশে কোন কালে হয়নি। এ ব্যাপারে বাঙালির প্রতিভার উল্লেখ আগেই করেছি। একটু বিশদভাবে বললে কথাটা স্পষ্ট হবে। দূর অতীতের কোন খ্যাতনামা, যাঁকে আমরা কখনো দেখিনি জানিনি চিনিনি, আমাদেব চোখে তাঁর একটা গ্ল্যামার থাকা স্বাভাবিক। তিনি আমাদের কাছে একটি রহস্য, একটি বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ তো বাল্মীকি বেদব্যাসের যুগের মানুষ নন, কালিদাসের কালেরও নন। নিতান্ত একেলে, আমাদেরই চোখে দেখা মানুষ। আমাদের মতো কত শত জন তাঁকে চোখে দেখেছেন, ঘিরে বসেছেন. তাঁর কথা শুনেছেন, গান শুনেছেন, তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছেন, এমন কি দিব্যি জমিয়ে হাসি গল্প করতেও দেখেছেন—তথাপি তাঁকে অনন্যসাধারণ মানুষ বলে চিনতে বাধা হয়নি। যাঁরা নিত্য দেখেছেন, একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের কাছেও তিনি এক পরম বিস্ময়। অতি-ঘনিষ্ঠতায়ও তাঁর মূল্যহানি হয়নি। এর কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের যতখানি, তাঁর গুণগ্রাহীদের ততখানি। বাঙালি এখানে তার রসবোধের, মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। শেক্সপীয়ার-এর দেশে শেক্সপীয়ার-এর বেলায় তো এমনটি হয়নি। যাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন, নিত্য মেলামেশা কবেছেন, এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরাও স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, জগতের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদেরই গা ঘেঁষে বসে আছেন। ম্যাথু আর্নল্ড সাধে বলেছিলেন— 'Thou didst tread on earth unguess'd at' অর্থাৎ তোমাকে চেনার সাধ্য ছিল না কারো। শেক্সপীয়ার-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে ঢের বেশি ভাগ্যবান বলতে হবে। জীবৎকালেই দেশে বিদেশে প্রচুর সমাদর তিনি লাভ করেছেন। অবশ্য দেশে এক দলের কাছে নিন্দা-মন্দও জুটেছে। তবে এ কথা স্বীকাব করতে হবে যে বাঙালি যেমন নিন্দা করতে জানে তেমনি আবার গুণকীর্তন করতেও জানে। যাই বলুন, নিন্দা জিনিসটাকে আমি খুব নিন্দনীয় বলে মনে করি না। সত্যি বলতে কি, আমি যে বাঙালি কালচারের কথা বলেছি, পরনিন্দা পরচর্চা তার জৌলুস অনেকখানি বাড়িয়েছে। আর একথাও সত্য যে, দেশে নিন্দুক যেমন ছিল, গুণগ্রাহীর সংখ্যাও তাব চাইতে বেশি বই কম ছিল না।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরে বঙ্গদেশ যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করেছিল, বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে সেটি এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেদিনের বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছে, কলকাতার টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রদত্ত মানপত্রের প্রথম বাক্যটিতেই তা স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশ পেয়েছিল—'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।' শুধু কলকাতা শহরে নয়. সারা বাংলা দেশেই নানা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সে বিস্ময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বাংলার বাইরেও প্রবাসী বঙ্গসন্তানেরা জয়ন্তীর জয়ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। বক্সা বন্দীশিবিরের রুদ্ধকক্ষেও বাঙালি বিপ্লবী যুবকদের কণ্ঠে রবীন্দ্রবন্দনা উচ্চারিত হয়েছিল। বর্তমানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী বাঙালির বার্ষিক পার্বণ। সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ন্যায় এর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তাতেই প্রমাণ, জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতব্যাপী যে উৎসব হয়েছিল তার হাঁকডাক জাঁকজমক দেখে আমাদের তাক লেগে গিয়েছিল। তথাপি এ কথা

শতবার বলব যে, সেই সত্তর বছরের যে জয়ন্তী উৎসব দেখেছিলাম, তেমন সুষমা-মণ্ডিত উৎসব পরে আর দেখিনি। উৎসব কমিটির সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্র, কমিটিতে বাংলা দেশের গণ্যমান্য কেউ বাদ ছিলেন না, মানপত্রটি রচনা করেছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র, নাগরিক সংবর্ধনায় মানপত্রটি পাঠ করেছিলেন, যদ্দুর মনে পড়ছে কবি কামিনী রায়। উৎসব উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় Golden Book of Tagore নামে যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তার তুলনা নেই। অমল হোম সম্পাদিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এর রবীন্দ্র সংখ্যা এখনও বহু গৃহে সযত্নে সংরক্ষিত।

সেই গিয়েছে একদিন, যখন বাঙালি মূল্যবানকে মূল্য দিয়েছে, গুণবানের গুণকীর্তন করেছে, মহতের মহত্ত্বকে স্বীকার করেছে। সেদিনের বাঙালির হয়ে ওকালতি করছি, এমন মনে করবার হেতু নেই। নিন্দার অস্ফুট গুঞ্জন সেদিনও শোনা গিয়েছে। এক দল বলে বেড়িয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর চেলাদের উস্কিয়ে দিয়ে নিজ জন্ম জয়ন্তীর ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য উদ্যোক্তারা ওসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। কথাটা অবশ্য অল্প দিনেই চাপা পড়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে কোন বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। সেদিনের সংবাদপত্রেরও এটুকু সুবুদ্ধি ছিল যে এ জাতীয় সংবাদকে তাঁরা উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। আজকের সংবাদপত্র সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। মুখরোচক এবং চাঞ্চল্যকর সংবাদের স্থান সর্বাগ্রে। এদিনের আর সেদিনের বাঙালিতে এই তফাত। এককালের বাঙালি মানভঞ্জনের পালায় যতখানি রস পেত, এখন মানহানির পালায় তার চাইতে বেশি পায়।

আমাদের উৎসবাদির মধ্যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব বোধকরি সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে এখন প্রায় জ্যেষ্ঠদের সমকক্ষ। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক হিসাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। সেই প্রথম। কিন্তু সেটি একটি একক অনুষ্ঠান। বৎসর বৎসর নিয়মিত জন্মোৎসব পালন তখনই আরম্ভ হয়নি। তাহলেও ওই উৎসবটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ ওই সংবর্ধনাটি তখন না হলে বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালি এক মস্ত বড় কলঙ্কের ভাগী হয়ে থাকত! কেননা এর দু বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। ওইটি না হলে বিশ্বসুদ্ধ মানুষ বলতে থাকত যে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছে ইয়োরোপ; তাঁর দেশবাসী তাঁর খবর রাখেনি, তাঁর মর্যাদা বোঝেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালির মুখরক্ষা করেছে।

জন্মোৎসবের রেওয়াজটা নোবেল প্রাইজের পরেও শুরু হয়নি। নিয়মিতভাবে কবির জন্মোৎসব করতেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা, দেশবাসীরা নয়। সঠিক ভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রজন্মোৎসব জনসাধারণের উৎসব হিসাবে শুরু হল কবির মৃত্যুর পর থেকে। তাহলেই দেখুন উৎসবটির বয়স এখনও পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। এদিকে সেই তখন থেকেই, বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে লক্ষ করা গিয়েছিল যে, আমাদের উৎসব পার্বণাদির দ্রুত রূপান্তর ঘটছিল। উৎসবমাত্রই উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হচ্ছিল। রবীন্দ্রজন্মোৎসবের হিড়িকটা যখন শুরু হল তখন সত্যি বলতে কি, মনে মনে প্রমাদ গণেছিলাম—কি

জানি, আমাদের ভক্তির আতিশয্যে ভদ্রলোকের কি দুর্দশাই না ঘটে ! মহিষমর্দিনী কিংবা নৃমুণ্ডমালিনী দেবীরা যে ধকল সইতে পারেন, মানবসন্তান রবীন্দ্রনাথ কি তা সইতে পারবেন ? অবশ্য দেব দেবীদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও এখন স্বর্গবাসী কিন্তু ভয় হত আমরা যারা এখনো মর্তধামেই আছি, আমরাই কি এর টাল সামলাতে পারব ? ভাবতাম— Sufficient unto the day is the evil thereof— এমনিতেই হাঙ্গামার নাই অন্ত, আর বাড়িয়ে লাভ কি ? তেরো পার্বণই তো যথেষ্ট ছিল, আবার চৌদ্দটি কেন ?

আমি ষোল আনার উপরে আঠারো আনা বাঙালি এবং স্বভাব-নিন্দুক বাঙালির ন্যায় আমি বহু ব্যাপারে হাল আমলের বাঙালির নিন্দা করেছি। এবং সেজন্যে নিজেও নিন্দাভাজন হয়েছি। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে অধঃপতন ঘটলেও বাঙালির সহজাত রসজ্ঞান সে এখনও হারায়নি। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন, রবীন্দ্রমেলা প্রভৃতি নানা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্রোৎসব দেখে শুধু আশ্বস্ত নয়, উৎফুল্ল বোধ করেছিলাম এই ভেবে যে, বাঙালিরা দেব-দেবীর চাইতে রবীন্দ্রনাথকেই বরং একটু বেশি সমীহ করে চলে। পূজা প্রাঙ্গণের চাইতে রবীন্দ্রোৎসবের প্রাঙ্গণ ঢের বেশি শান্ত সংযত, পরিবেশ অধিকতর রুচিসম্মত। এখানেই বাঙালি মূল্যবোধের পরিচয়। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে এটি যথার্থই বাঙালি জনোচিত, বাঙালি স্বভাবের পরিচায়ক। বাঙালি কবি বলেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তেমন মানুষ পেলে বাঙালি দেবতার উপরে তাঁকে স্থান দেয়। বিশেষ করে যাঁকে নিয়ে এই উৎসব তিনি নিজেও বলেছিলেন—মানুষের বাইরে আমার কোন দেবতা নেই। চণ্ডীদাস এবং রবীন্দ্রনাথ—আমাদের দুই মহাকবি এক কথাই বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য।

ভাবতে খুব আনন্দ হয় যে, আমাদের কবিরা মানুষ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, এদেশের মানুষরা আবার কবি সম্বন্ধে সে কথাই বলেছে। বলেছে—সবার উপরে কবির আসন, তাহার উপরে নাই। ভারতীয় সভ্যতার এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদেশে কবির আসন সর্বোপরি। কবিকেই মুনি ঋষি দ্রষ্টব্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেদ উপনিষদ রচয়িতাদের আমরা ঋষি বলে গণ্য করে থাকি। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে কবি এবং কবি বলেই তাঁদের আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি হিসাবে মান্য করি। শুধু বেদ উপনিষদ রচয়িতারা নন, রামায়ণ মহাভারতের কবিরাও—যদিচ হৃদয়গ্রাহী কাহিনী রচয়িতা—তাঁরাও সমপর্যায়ের ঋষি এবং একই উচ্চাসনের অধিকারী।

সাহিত্যরসিকরা জানেন যে, পশ্চিম দেশে কবিকে অনুরূপ উচ্চাসন দেওয়া হয়নি। কবি সম্বন্ধে তাঁরা একটু সন্ধিগ্ধচিত্ত। কবিকে তারা ফেলতেও পারেনি, গিলতেও পারেনি। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচনা করেছেন তাতে সমাজের সকলেরই স্থান এবং কর্তব্যাদি নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু কবিকে সেখানে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। বরং সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, ওই ব্যক্তিটিকে প্রশ্রয়ও দিয়ো না, আশ্রয়ও দিয়ো না। অসম্মান করতে বলেন নি ; বলেছেন, তোমাদের নগরে কখনো কোন কবির আগমন হলে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে, মালা চন্দন দিয়ে বরণ ক'রো। কিন্তু ওইটুকুই, তার বেশি নয়। রীতি প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে সবিনয়ে নগর ছেড়ে চলে যেতে

বলবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে প্লেটো কবি মানুষটিকে খুব একটা নিরাপদ ব্যক্তি বলে মনে করেননি।

প্লেটোর ওই উক্তি নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে এখনও হচ্ছে। অনেকেই এ উক্তির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ভাবলে দেখা যাবে প্লেটোর কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। কবি মানুষরা স্বভাবতই একটু খেয়ালী প্রকৃতির ; কখন যে কি বলে বসবেন তার ঠিক নেই। সমাজ বিরোধী, রাষ্ট্র বিরোধী, এমন কি দেবধর্ম বিরোধী নানা কথা বলে দেশময় বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে দেবেন। প্লেটো ছিলেন রাষ্ট্র-অন্ত প্রাণ। কবিরা পাছে খেয়াল খুশির বশে রাষ্ট্রকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেন, মনে হয় প্রধানত সে কারণেই তিনি কবি সম্বন্ধে ওই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। প্লেটো জানতেন যে, কবির কথায় এমন মাদকতা আছে যে, তিনি অতি সহজেই লোকের মন মজিয়ে দিতে পারেন। কবি যদি দেশের লোককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয় তাহলে শাসনকর্তারা তাকে রোধ করতে পারবেন না ; অর্থাৎ শক্তির পরীক্ষায় শাসক গোষ্ঠী কবির সমকক্ষ নন। আর লক্ষ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিরা ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার বিরোধী। এজন্যে দেশের শাসক সম্প্রদায় কবি মানুষদের খুব একটা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা ভাবেন কবিরাই লোকের মাথায় যত রকম দুর্বুদ্ধি জোগান এবং অশান্তির সৃষ্টি করেন। এই রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরুন না, তাঁকে নিয়েও আমাদের সরকার বাহাদুরের দুশ্চিন্তা কিছু কম ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতই সারা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ সরকার সে কথাটি ভোলেনি। সেই থেকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টিকেও একটু সন্দেহের চোখে দেখেছে। আসাম সরকার তো একসময়ে ফতোয়া জারি করেছিল সরকারি কর্মচারীরা যেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁদের ছেলেদের না পাঠান। তাঁদের ধারণা ছিল, ওখানে ছেলেদের কানে রাজদ্রোহের মন্ত্র জপানো হয়। বাংলা সরকার তেমন কিছু করেনি, কিন্তু বিদ্যালয়টির উপরে নজর রেখেছে বরাবর। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়—বিশ্বভারতী স্থাপন করেন তখন ইংরেজ-সরকার তাকে স্বীকৃতি দেয়নি, অর্থাৎ এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করে এখানকার নিদর্শনপত্রের জোরে সরকারী চাকুরি পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্লেটো খুব আজগুবি কথা বলেননি ; কেননা এ ক্ষেত্রেও কবি এবং সরকারের সম্পর্কটি বড় মধুর ছিল না। ইংরেজ সরকার একবারই তাঁকে উপাধি দানে সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু সে সম্মান যে শেষ পর্যন্ত বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছিল সে কথা এখন সকলেরই জানা।

কর্তা ব্যক্তিতে আর কবি মানুষে কখনো মনের মিল হয় না। কর্তা চান কর্তৃত্ব বজায় রাখতে, কবি কোন প্রকার কর্তৃত্বই বরদাস্ত করতে পারেন না। এই তো দেখুন না, রবীন্দ্রনাথ কি বলছেন—'বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,/বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,/তারি সম্ভাষণ।' এখন আপনারাই বলুন দেশের শাসক গোষ্ঠী কি এমন মানুষ সম্বন্ধে-খুব নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন ? এ জাতীয় সর্বনেশে কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনভর অনেক বলেছেন। আর এসব কথা শুধু যে সরকার বিরোধী এমন নয়, ধর্মান্ধ সংস্কারান্ধ সমাজপতিদেরও বিরোধী। এজন্যে দেশের প্রাচীনপন্থীরাও তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। আজ থেকে সত্তর পঁচাত্তর বছর

আগে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা হল। প্রাচীনেরা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করছেন। পরে যখন তাঁর বিদ্যালয়ে নৃত্যশিক্ষার প্রবর্তন হল এবং মেয়েরা নানা অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত পরিবেশন করতে লাগলেন তখন শুধু প্রাচীনপন্থীরা নন, অনেক প্রগতিপন্থীরাও প্রমাদ গণেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র উচ্চশিক্ষিত উদার-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতায় কখনো শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী আয়োজিত নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হলে সঞ্জীবনী পত্রিকায় সে সংবাদ প্রকাশিত হত। কিন্তু সংবাদটির শিরোনাম হিসাবে লেখা হত—'অধঃপাতের পথে'। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বামুন কায়েত, তথাকথিত নিচু জাতের ছেলে এবং মুসলমান খ্রিস্টান ছাত্র এক ঘরে থেকেছে, একই রান্নাঘরে খেয়েছে। আজ নয়, আজ থেকে সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের কথা বলছি। তখন এসব কথা ভাবাও খুব সহজ ছিল না। জাতীয় সংহতি national integration ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে আজ দেশসুদ্ধ লোক পরিত্রাহী চিৎকার শুরু করেছে, আর রবীন্দ্রনাথ সেই কবে তাঁর বিদ্যালয়ে গুজরাটী মারাঠী, তামিল, তেলেগু ভাষী ছেলেদের এনে জড় করেছিলেন। অধ্যাপক কর্মীদের মধ্যেও বেশ কিছু ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশবাসী। শান্তিনিকেতনে প্রথমাবধিই অতি ক্ষুদ্রাকারে ভারতীয় জীবনের একটি সমন্বয় প্রয়াস চলে আসছিল। বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। গিয়েছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। গান্ধীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কি দেখেছেন। বললেন, শান্তিনিকেতনে যাননি ? আগে গিয়ে শান্তিনিকেতন দেখুন— Santiniketan is India এ কথা গান্ধীজী সাধে বলেছেন ? ভারতচিন্তা শান্তিনিকেতনে যতখানি হয়েছে এমন আর কোথায় ?

বহু ব্যাপারে দেশের অগ্রগতির পথ শান্তিনিকেতনই রচনা করেছে। শান্তিনিকেতন যে একটি Silent revolution, সে কথাটি লোকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। কবি এবং বিপ্লবীতে এক পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান, এ কথাটির আভাস পূর্বেই গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে একটি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সে কথা আজ বিস্মৃত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই লক্ষ করেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনের ওই বিপ্লবী ভূমিকাটির কথা কেউ ভাবে না, কেউ বলে না। দুঃখ করে বলেছিলেন, 'হায়রে দূরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী, সেটা কারো কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না।' বাস্তবিকপক্ষে শান্তিনিকেতনকে বুঝলে তবে রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে বোঝা যাবে।

বাঙালির রসজ্ঞানের তারিফ করেছি। রসজ্ঞান মস্ত বড় কথা ; কিন্তু সকল জ্ঞানই জীবনের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ আমাদের জীবনের ব্যবহারে লাগলে তবেই তা সার্থক। এই যে বছরের পর বছর জন্মতিথি পালন এ যেন অনেকটা রিচুয়েল-এ পরিণত হয়েছে। আমাদের নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। নতুনত্ব কিছু নেই, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি—গানের আসর, নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান, কিছু ভাবগম্ভীর বক্তৃতা। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা সাঙ্গ করবার কথাও অনেকের মুখে শোনা যায়। কথাটা শুনলেই আমার কেমন হাসি পেয়ে যায়। বর্তমানে গঙ্গাজল এত দূষিত যে, তাকে আর পূজায় ব্যবহারের যোগ্য বলা চলে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের পূজার উপকরণসমূহকে আমি দূষিত বলছি এমন কখনো মনে করবেন না। শুধু বলতে চাই

যে, প্রত্যেকটিরই ব্যবহার এমন অপর্যাপ্ত যে, ভয় হচ্ছে পাছে ভালো জিনিসেও লোকের অরুচি ধরে যায়।

সেজন্যে বলছিলাম যে, উৎসব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনা চিন্তার একটু আধটু অদল বদল করার বোধ করি সময় এসেছে। আমরা এ যাবৎ শুধু রবীন্দ্র জন্মোৎসব করে আসছি, রবীন্দ্রোৎসব করছি না। দুটিতে তফাৎ আছে। রবীন্দ্রোৎসব বলতে আমি বুঝি রবীন্দ্র জীবনের উৎসব। তিনি নিজে কী জীবন যাপন করেছিলেন, আমাদের সমাজ জীবনকে কি ভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা এ উৎসবে খুব একটা স্থান পায় না। গান্ধীজী বলেছিলেন— 'My life is my message'. সকল মহাপুরুষেরই ওই এক বাণী—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।' রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে দেশ কি পেল অর্থাৎ আমরা কি পেলাম সেটাই প্রশ্ন। সোজা কথায়, অগণিত কাব্য-গাথায়, গল্পে কাহিনীতে, নৃত্যে গীতে এত যে সৌন্দর্য মাধুর্যের সৃষ্টি করলেন, বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে সে সৌন্দর্যের ছাপ কতটুকু বেড়েছে তাই দিয়ে উৎসবের সার্থকতা যাচাই করতে হবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং রবীন্দ্র জীবনের উৎসব এক নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'। তাই বলে যদি বলি, কবিরে পাবে তার রচনাবলীতে, তাহলেও কথাটা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্য নাটক, গল্প উপন্যাস রচয়িতা নন, তিনি শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনেরও রচয়িতা। বাংলা দেশের প্রতিটি গৃহ সুখে স্বাস্থ্যে আনন্দে একেকটি শ্রী-সৌন্দর্যের নিকেতন হবে, জীবনভর এই স্বপ্ন দেখেছেন। প্রাচুর্যের কথা ভাবেননি, উপকরণ বাহুল্যের কথা বলেননি। অভাব অনটনের মধ্যেও সহজসাধ্য উপায়ে সরল শোভন জীবন বিন্যাসের কথা বলেছেন। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত একটি স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। সে জীবন এতই সরল যে, অধিকাংশ বাঙালি গৃহস্থেরই তা সাধ্যায়ত্ত ছিল। সামান্যতম শিক্ষা এবং রুচির মিশ্রণে সমস্ত দেশের পল্লী-জীবনকে তিনি নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্যে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনকে আমি অন্যত্র বলেছি applied Rabindranath। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে তাঁর দেশ গঠনের ভাবনা চিন্তাকে এখানে তিনি একটি বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা শুধু কবি রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবি, কর্মী রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবি না। তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এমন অনেক প্রস্তাব পরিকল্পনা আছে, যা থেকে আমাদের দেশের উপযোগী একটি সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি হতে পারে।

আগেই বলেছি বাঙালি উৎসবপরায়ণ জাতি। দোষের কথা নয়, গুণের কথাই। তবে বাঙালির স্বভাবে একটু আতিশয্য দোষ আছে। কোন কিছুকে একবার যদি ধরে, তবে একবারে চূড়ান্ত করে ছাড়ে। উৎসাহের আতিশয্যে আমরা রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী, শতবার্ষিকী ইত্যাদি নানা নামে উৎসবের বহর এবং বাহার ক্রমে বাড়িয়েই চলতে থাকি। ১২৫ বছরের একটা বিশেষ নাম আছে কিনা আমি জানি না, তবে এর বিশেষ কোন Sanctity আছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য পঁচিশ-পঞ্চাশের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এমন বিশ্বাস আমার নেই। এসব বাড়াতে

গেলেই নানা সংস্কারের সৃষ্টি হয় এবং পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়।

এর চাইতে ঢের বড় কথা এই যে, শিক্ষিত বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথ আজ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রতিদিনই তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয়। আমি স্মরণ না করলেও অপরে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। বন্ধু-মজলিশে, চায়ের দোকানে, কফি হাউসে, রেডিয়োতে, টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথ নিত্য আমাদের সমুখে উপস্থিত। তিনি আমাদের জীবনে কতখানি অনুপ্রবেশ করেছেন এখানেই তার প্রমাণ। বৎসরান্তে একদিন ঘটা করে স্মরণ করার চাইতে একে আমি ঢের বেশি মূল্য দিই। একটু ভেবে দেখলে সবাই বুঝতে পারবেন যে, এটিই আমাদের রবীন্দ্রোৎসবের প্রধানতম অঙ্গ। 'নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি' বলতে পারলে আর কথা ছিল না; কিন্তু 'চিত্ত ভরিয়া' না হলেও এই যে নিত্য স্মরণ করছি, এও কম কথা নয়।

একটা বিশেষ উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে, বহু লোক জুটিয়ে, প্রচণ্ড কোলাহলে প্রকাণ্ড আয়োজনে একটা বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেই যথার্থ ভক্তি প্রকাশ হল এবং মস্ত বড় কিছু করা হল, এরূপ ভাবাটা পরিণত মনের পরিচায়ক নয়। এই তো বৎসর কাল ধরে সারা দেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশতম আবির্ভাব উৎসব পালিত হচ্ছে। দেশে বৈষ্ণব পদাবলী আছে, কীর্তন আছে, ফোঁটা তিলক আছে কিন্তু খাঁটি চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব কজন? প্রেমের বন্যায় নদে ভেসে যায়—শুধু নদীয়া নয়, সারা বাংলা দেশই ভেসে গিয়েছিল। চৈতন্য ভক্ত বলেছিলেন—মেরেছিস কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? এখন সেই প্রেম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কিন্তু কলসির কানাটি ঠিক আছে। অবশ্য এখন কলসির কানার চাইতে ঢের বেশি মারাত্মক বস্তু ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। সরলচিত্ত ধর্মপ্রাণ মানুষরা shocked হবেন কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেশময় হিংসার তাণ্ডবের মধ্যে এসব উৎসব নিষ্ঠুর কৌতুক বলে মনে হয়। উৎসবের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষদের জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটুকুই শুধু উদ্‌ঘাটিত হয়।

অপরাধ শুধু বাঙালির নয় বা ভারতবাসীর নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীই মহাপুরুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। কিছুকাল আগে বুদ্ধদেবের আড়াই হাজার বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী উৎসব হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি তখন ভেবেছি যে বুদ্ধকে আমরা দেশ ছাড়া করে ছেড়েছি। আশ্রয় নিয়েছিলেন তিব্বতে চীনে জাপানে সিংহলে। এখন চীন তিব্বত থেকেও বিতাড়িত। সিংহলও তার সিংহবিক্রম দেখাচ্ছে। খ্রিস্টান জগৎ যীশু খ্রিষ্টকে কতখানি সম্মান দেখিয়েছেন? আমেরিকা এক ২৫শে ডিসেম্বর খ্রিস্ট জন্মোৎসব সমাধা করে ২৮শে ডিসেম্বর হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মার্কস ধর্মগুরু নন কিন্তু মানব কল্যাণী হিসাবে কারো অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কৌতুকের কথা যে সংবাদপত্রের হিসাবে দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়ার অস্ত্রসম্ভারে মার্কসপন্থী সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকাকেও টেক্কা দিয়েছে। মার্কসবাদীরা মার্কসকে বাদ দিয়ে এখন নিউক্লিয়ারবাদী হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে শুধু লঙ্কায় নয়, যে যায় ক্রেমলিনে সেও হয় রাক্ষস। গুরুবাদীরা সকলেই সমান। হাতের কাছে গান্ধীর দশা কি হয়েছে? বুদ্ধ মহাবীর যীশু গান্ধী মানুষের কাছে এত যে অহিংসার বাণী প্রচার করে গেলেন, সে মানুষের এমন হিংসার উন্মত্ত মূর্তি, পৃথিবীময়

এমন নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো কি দেখা গিয়েছে ? তাহলেই দেখুন, এই যাঁদের নাম করছিলাম, আজকের ইতিহাস এই সব ক'জনেরই ট্র্যাজেডির ইতিহাস। মানুষের কপট আচরণই এই ট্র্যাজেডির মূলে।

ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে অজ্ঞতা, অন্ধতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত করে দিয়েছে। অথচ আমাদের এই বাংলা দেশেই রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—যত মত তত পথ—ধর্মে যদি মতি থাকে তাহলে যে পথে চলবে সে পথেই ইষ্ট লাভ হবে। যে দেশে এমন কথা উচ্চারিত হয়েছে, সে দেশে এ দুর্মতি কি করে হল যে, সামান্যতম মতান্তরে ছোরা মারছে, বোমা ছুঁড়ছে ! অন্যত্র যাই ঘটুক, বাঙালির পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

পৃথিবীতে কত মহামানব এলেন গেলেন, কত মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, কিন্তু লাভ কি কিছু হল ? মানুষ যে তিমিরে সে তিমিরে। এসব কারণে কোন মহান ব্যক্তিকে নিয়ে যখন উৎসবের আয়োজন হয় তখন খুব একটা উৎফুল্ল বোধ করি না। রবীন্দ্রনাথের এইটুকু বাঁচোয়া যে তিনি ধর্মীয় নেতা নন, দেশ-নেতাও নন। ধর্মপ্রচার করেননি, রাজনীতিও করেননি। তিনি কবি ; কবির সঙ্গে কপট আচরণের অবকাশ খুব প্রশস্ত নয়। কোন ধর্মগুরুর অনুচর হয়ে আমি বকধার্মিক সাজতে পারি, স্বদেশ-প্রাণ নেতার অনুগামী হয়ে দেশপ্রেমিক সাজতে পারি, কিন্তু কবির অনুরাগী হয়ে কবি সাজতে গেলে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যাব। তাই বলে কবির অনুকরণ অনুসরণ হয়নি এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রবীন্দ্রসান্নিধ্য একটা সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চলনে বলনে কিছু অভিনবত্ব থাকত। 'রবিয়ানা' বলে একটা কথার চল হয়েছিল ; কেউ কেউ বলত শান্তিনিকেতনী ঢঙ।

রবি অস্ত যাবার পরে রবিয়ানা কথাটা লোপ পেয়েছে, এখন আর কারো মুখে শোনা যায় না। লোক দেখানো কিছু যদি বা এক সময়ে ছিল, এখন আর তা নেই। রবীন্দ্রভক্তি দেখিয়ে এখন আর কারো কিছু লাভ হবে না। ও জিনিস আজকের বাজারে বিকোবে না। কিন্তু বাজারে যে জিনিস মূল্যহীন তাকে যে মূল্য দিতে শিখেছে সে-ই অমূল্যকে চিনেছে। বলছিলাম, মহাপুরুষদের মহোৎসবে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই। তথাপি আমার ন্যায় অবিশ্বাসীর মনেও এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, প্রতি বছর বৈশাখের একটি দিনে এই যে সারা বাংলা দেশ এমন করে মেতে ওঠে, এ নিতান্ত লোক-দেখানো ব্যাপার হতে পারে না। যথার্থ অন্তরের টান না থাকলে বছরের পর বছর এ জিনিস চলতে পারত না। এমন কথা বলছি না যে উৎসবে যোগদানকারীরা সকলেই কাব্যরসিক—রবীন্দ্রকাব্যে, রবীন্দ্রদর্শনে পারদর্শী। কবির জন্মোৎসবে যোগ দিতে হলে কাব্যরসিক হতে হবে এমন মাথার দিব্য কেউ দেয়নি। বাঙালি যে রবীন্দ্র উৎসবে এতখানি উৎসাহ পাচ্ছে তার প্রকৃত কারণ সে জীবনরসিক। রবীন্দ্রনাথ ওইটুকু চেয়েছেন। জীবনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন—সকল অঙ্গে মনে জীবনের রসটিকে আহরণ করতে বলেছেন। জীবনের রস বলতে শুধু সুখের অনুভূতিটুকু নয়। জীবন তো দুঃখ আঘাতকে বাদ দিয়ে নয়। সুখ দুঃখ মিলিয়ে জীবন বড় সুন্দর, বড় মনোহর—এই মহা সত্য রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর কাব্যে নয়, তাঁর নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যত দুঃখ আঘাত পেয়েছেন এমন ক'জন মানুষের জীবনে ঘটে ! তথাপি বলেছেন—'লাগল ভালো, মন ভোলালো/এই কথাটাই

গেয়ে বেড়াই/লাগল ভালো'। কবির মনে সেই অ্যালকেমি আছে, যার গুণে গভীরতম দুঃখও নিবিড়তম আনন্দে পরিণত হয়। ট্র্যাজেডির মর্মন্তুদ কাহিনী চোখের সমুখে উপস্থাপিত—যবনিকাপতন যখন হল তখন দর্শকের চোখে জল, মুখে হাসি। বলে—আহা, কী অপূর্ব সুন্দর। আনন্দ, আনন্দ, বড় আনন্দ পেলাম।

কবি আনন্দ স্রষ্টা, তিনি আনন্দদাতা। অন্নদাতার চাইতে আনন্দদাতা কিছু কম নন। তিনি মানুষের পরম আত্মীয়। তিনি মনের কথা জানেন, মনের কথা বলেন, হাসান, আবার কাঁদানও। এ মানুষের চাইতে আপনার জন আর কে? বাঙালি তার সত্যিকারের আপনজনকে চিনেছে। সে জন্যই এ উৎসব এত স্বতঃস্ফূর্ত। এমন আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু একটি কথা উদ্যোক্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি। উদ্যোক্তারা নিজেরাও জানেন যে এ উৎসব কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের সংখ্যা বড় জোর শতকরা তিরিশ জন। দেশের শতকরা সত্তর জনই এই আনন্দোৎসবের বাইরে পড়ে আছেন। উৎসবে যোগদানের অধিকার তাঁদের নেই, কেননা তারা নিরক্ষর। রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্যে যে আনন্দের ভোজ সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন, সে ভোজ থেকে তারা বঞ্চিত। আমাদের দেশের ওই তো প্রধান রোগ। এখন দেশে খাদ্যের অভাব নেই; কিন্তু দেশের অর্ধেক লোক এখনও অনাহারে থাকে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অপর্যাপ্ত আনন্দসম্ভার আমাদের হাতে, কিন্তু দেশের দুই তৃতীয়াংশ লোক তার ভাগ পাচ্ছে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণ হলে তবে এই দুরবস্থার দূরীকরণ হতে পারে। এই কাজটিকে উৎসবের অঙ্গীভূত করে নিতে পারলে তবেই উৎসবটি একটি উদ্দেশ্যসাধক সার্থকতা লাভ করবে। রেডিয়ো টেলিভিশন গ্রামোফোন রেকর্ডের দৌলতে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছে, সুর শুনেছে কিন্তু তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। অক্ষর পরিচয় হলে তবে চাক্ষুষ পরিচয় হবে। এ কাজ প্রধানত সরকারের করণীয়। দেশের অগণিত সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্রোৎসব পালিত হয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হবে সরকারকে এ বিষয়ে নিরন্তর অবহিত করা। জন্মোৎসবটা শুধুই স্মরণোৎসব নয়। বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে কিছু কর্মকাণ্ডের যোগ না থাকলে উৎসাহ উদ্যমের অপচয় ঘটে।

উৎসব অনুষ্ঠানে দোষ ত্রুটি থাকতে পারে তাহলেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালির কতখানি গর্ব সে কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না। যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গেই সে জন্মতিথিটি পালন করছে। কিন্তু সকল মহাকবিই দেশ কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে যান। রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যে বাংলার কথা যতখানি, বাংলা ছাড়িয়ে ভারতের কথাও ততখানি এবং ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের কথাও কিছু কম নয়। খুব সঙ্গতভাবেই তাঁকে ভারতের জাতীয় কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র জাতির কবি হিসাবে রবীন্দ্রজন্মোৎসবকে নেহরু একটি সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছিলেন। কবির শতবার্ষিকী উৎসব সর্বভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নেহরু প্রতি রাজ্যে একটি করে রবীন্দ্র ভবন স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্থাপিত হয়েছে, আশা করি। বাংলার বাইরেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য পঠন পাঠনের জন্যে রবীন্দ্র অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, শুনেছি। উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু সিদ্ধি কতটুকু? রাজ্যে রাজ্যে রবীন্দ্রভবন এবং নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র চেয়ার কি রবীন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় ইমেজ তৈরি করতে পেরেছে? ভারতীয় মনের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে?

শতবার্ষিকী উৎসবের পরে পঁচিশ বৎসর গত হয়েছে। সালতামামির বিচারে দেখা যাবে ভারতমাতার সন্তানেরা মায়ের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা নিয়ে তুমুল বিবাধ বাঁধিয়েছে। দেখে শুনে মনে হয় ভাগের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নেই। গত ক' বছরেই দেশকে ভঙ্গদশায় পেয়েছে—তেলেগু দেশম, অহম দেশম, অকালি দেশম-এর উদ্ভব হয়েছে। বড় রকমের দেশ বিভাগ তো আগেই হয়ে গিয়েছে। এই যে গণ্ডী বিভাগ—এইটুকু আমার সীমানা, এখানে কেউ নাক গলাতে এসো না—এই মন নিয়ে কি রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সম্ভব ? যিনি দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—আমাদের একটি মাত্র দেশ আছে, সে দেশের নাম বসুন্ধরা, একটি মাত্র জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি—তাঁরই দেশের মানুষ যখন নিজের দেশটিকেই টুকরো টুকরো করে আলাদা গেরস্থালির ব্যবস্থা করে, তখন তারা কি আর নিজেদের রবীন্দ্রনাথের দেশবাসী বলে পরিচয় দিতে পারে ? এ জাতীয় সংকীর্ণতা থেকে বাঙালিরা সম্পূর্ণ মুক্ত এমন কথা বলছি না। তবে লক্ষ করে দেখেছি, অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় বাঙালির মধ্যে প্রাদেশিকতার ভাবটা কম। যাহোক, এ সংকীর্ণমনা প্রাদেশিক ভাবাপন্ন সকল ভারতবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে ওয়ার্লড পোয়েট বা বিশ্বকবি আখ্যা দিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের মান বাড়াবার চেষ্টা করে, জানতে ইচ্ছা করে, এদের বিশ্বটির আয়তন কতটুকু ?

এই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমার দেশ পৃথিবীব্যাপী—ভারতবর্ষে এ কথাটা নতুন নয়, রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেছেন এমন নয়। এ ধারণা ভারতীয় সাধনার মধ্যে নিহিত। আজ থেকে হাজার বছর আগে শংকরাচার্য তাঁর একটি স্তোত্রে বলেছেন—

'ভ্রাতরো মানবাঃ সার্ব, স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্ ॥'

ভাবুন একবার, সেই কতকাল আগে ভারতীয় মনীষী বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ আমার ভ্রাতা, সমস্ত ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ। কত বড় মন নিয়ে বিশ্ব মানবের কথা ভেবেছেন !

আজ দেশের বড় দুর্দিন। আমাদের মহাভারত খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভারতে পরিণত হতে চলেছে। দেশে যা কিছু বৃহৎ এবং মহৎ, তাই নিয়ে ভারত। বাঙালি অবাঙালি সকলে যদি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থই ভারতের গৌরব বলে মনে করে, তাহলে রবীন্দ্রোৎসবকে ভারতোৎসব হিসাবে দেখতে দোষ কি ? সম্প্রতি ইয়োরোপ আমেরিকায় ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবার আমাদের রবীন্দ্রোৎসব সারা দেশে ভারতোৎসব হিসাবে পালিত হোক। 'গাও ভারতের যশো গান'—এই হোক্ এবারকার উৎসবের মূলমন্ত্র। ভাষার গণ্ডী, ধর্মের গণ্ডী, জাতের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসার আহ্বান রবীন্দ্রনাথের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে বারংবার। এবার সেই আহ্বান ধ্বনিত হোক্ সকল ভারতবাসীর মুখে।

নিজ ভাষার, নিজ দেশের গর্ব মানুষ করবে বইকি। রবীন্দ্রনাথ সে গর্ব ভুলতে বলেননি। স্বদেশী আন্দোলনের কালে বাংলার মাটি, বাংলার জলের গুণকীর্তন করেছেন। পরে যখন ভারতবন্দনায় বিশাল ভারতের উল্লেখ করেছেন—পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ—তখন বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—বৎস তুমি শুধু বঙ্গসন্তান নও, তুমি ভারতসন্তান। তেমনি যখন ভারতবর্ষকে মহামানবের সাগরতীর বলে বর্ণনা করেছেন তখন তাকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু

গোড়ার কথাটি ভুললে চলবে না। মূলত আমরা সকলেই মানব সন্তান এবং সকল মানুষের সঙ্গে আমরা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন মুক্তির বার্তা নিয়ে। চেয়েছিলেন, মনটা যেন এক জায়গায় বাঁধা পড়ে না থাকে, সে ক্রমাগত নিজেকে প্রসারিত করবে দূরে দূরান্তরে।

বাংলা দেশে একটা সময় গিয়েছে তখন বাঙালি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অতি সুস্পষ্ট। বাঙালি চরিত্র বলতে অবশ্য শিক্ষিত বাঙালির কথাই বলছি। বলা বাহুল্য, বাংলার বহু মনীষীরই তাতে অবদান আছে। তবে সেদিনের বাঙালি রবীন্দ্রভাবনাতেই প্রধানত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বাঙালির মন সেদিন বহু শাখায় প্রসারিত হয়ে পল্লবে পুষ্পে শোভিত এবং সুরভিত হয়ে উঠেছিল। তার মনের দিগন্ত সীমাহীন বিস্তার লাভ করেছিল, তার জগৎটাই গিয়েছিল বড় হয়ে। বাঙালির সেই মন আজ গিয়েছে বিলকুল বদলে। পলিটিক্স তার মনকে এমন শত পাকে জড়িয়েছে, হাতের কাছের ঘরের কাছের আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে সে এমন ব্যস্ত যে, দূরের কথা, আগামী দিনের কথা সে আর ভাবতেই পারে না। এর ফলে বাঙালি চরিত্র কুঁকড়ে মুকড়ে কৃশ হয়ে যাচ্ছে। আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। বাঙালি জীবনে অধোগতি সুস্পষ্ট। দেশের ইনটেলেকচুয়েল জীবনে একদা বাঙালি ছিল শীর্ষে, আজ তার স্থান তলদেশে। একমাত্র পলিটিক্স ছাড়া সর্বত্র সে নীরব নিস্পন্দ নির্বাপিত। এবারকার রবীন্দ্র উৎসবে এটাও একটা মস্ত বড় ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম এবং কি হারিয়েছি সেটা একবার খতিয়ে দেখলে আমাদের কল্যাণ হবে।

আমরা যে মানুষকে মহামানব বলি, সে মানুষ এতই বৃহৎ যে গোটা মানুষটাকে দেশের মধ্যে ধরে না, কিছু তার দেশ ছাপিয়ে যায়। বাংলা ছাপিয়ে সারা ভারতে, ভারত ছাপিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে কত তাঁর সমাদর হয়েছে সে তো আমরা দেখেছি। অপর দিকে যে কালে তাঁর জন্ম, সে কালকেও তিনি অতিক্রম করে যান। অনাগত দিনের কথা ভেবে অনেক কথা তিনি আগাম বলেন। সেজন্যে তাঁর সমকালীন মানুষরা তাঁর সকল কথা ঠিক ভাবে বুঝতে পারে না। তাই বলে কিছুই খোয়া যায় না, দেশে বিদেশে ভবিষ্যৎ কালে মানুষ আবার নতুন করে তাঁকে আবিষ্কার করে। তাহলেও বলব, আজকের শিক্ষিত বাঙালির এক্ষেত্রে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। রবীন্দ্রযুগের এখনও অবসান হয়নি। আমরা রবীন্দ্রযুগেই বাস করছি। বাঙালি জীবন আজ যে হতশ্রী মূর্তি ধারণ করেছে, এটিই যদি বাঙালির পরিচয় বহন করে আগামী দিনের অভিমুখে চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা এই বলে আমাদের ধিক্কার দেবে যে, রবীন্দ্রনাথের সমকালে এমন কি তাঁর জীবৎকালে বাস করেও এরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছুই পায়নি। কাজেই আজকে রবীন্দ্রোৎসবের প্রধান কাজ হওয়া উচিত বাঙালি জীবনকে সকল প্রকার স্থূলতা কুশ্রীতা থেকে মুক্ত করে তাকে সুশ্রী সুন্দর রুচিরোচন করে ঢেলে সাজানো। রবীন্দ্র জীবন এবং আমাদের জীবন—দুই থেকেই বিচ্ছিন্ন বলে উৎসবটা একটা বিলাসের আকার ধারণ করেছে। মনে রাখতে হবে যে, বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রনাথই একটা উৎসব। একদা রবীন্দ্রনাথ সুরে তালে রঙে রসে ছন্দে বাঙালি জীবনে আনন্দের সুন্দরের মধুরের এক মহোৎসব লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মহোৎসবকে আবার আমাদের জীবনে আবাহন করে

আনতে হবে। ইংরেজিতে এলিজাবেথান স্পিরিট বলতে যেমন প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার ভাবকে সূচিত করে, তেমনি রবীন্দ্র যুগ কথাটি যেন অনিবার্যভাবে আমাদের মনে নবীনতা সজীবতা সরসতা এবং সৌন্দর্যের ভাবকে সর্বদা জাগিয়ে তোলে।

অজানা অচেনা রবীন্দ্রনাথ

ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে। সাড়া পড়েছে বনে বনান্তরে। মাধবী মালতী মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ; মনে প্রশ্ন—কে এই পথিক ? এ কি আমাদের চেনা জানা আপনজন ? এই মনে হয়, ও বুঝি আমারই, পরমুহূর্তেই মনে হয় আমার নয়। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে—'বলো বলো বলো পথিক, বলো তুমি কার ?' ঋতুরাজ অভয় দিয়ে বলে—'আমি তারই, যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে।' মাধবী মালতী আশ্বাসের বাণী শুনেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হয় না। বলে—'হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে—মোদের বলে দেবে কে সে।'

ঋতুরাজ বসন্ত আর রসরাজ কবির স্বভাবে একটা মিল আছে। কবি বলতে অবশ্য মহাকবিদের কথাই বলছি। মহাকবির আগমনে মনুষ্য সমাজে সাড়া জাগে। কিন্তু বেশির ভাগ সাধারণ মানুষও মাধবী মালতীর ন্যায় বিভ্রান্ত। কারণ তারা কবিকে ঠিক চিনতে পারে না, কবির কথা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। স্বভাবের মিল আছে বলেই বসন্তের ন্যায় কবিও বলেন—আমি তারই যে আমারে যেমনি ভাবে চিনতে পারে। বলেন—আমি কত কথা বলি ; তোমরা যে যেমনভাবে বুঝে আনন্দ পাও তার মধ্যেই আমাকে পাবে। বাস্তবিক পক্ষে কবি কোন কথা যে অর্থেই বলে থাকুন সেটাই একমাত্র অর্থ এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। নিজ কাব্যের উপরে কবির যতখানি অধিকার, পাঠকের ততখানি। বহুকাল আগে একজন খাঁটি কাব্যরসিকের মুখে একটি বড় সুন্দর কথা শুনেছিলাম। বলেছিলেন—অনেক রাত অবধি কাজ করছিলাম। কাজ সেরে শুতে যাব, ভাবলাম স্ত্রী যেখানে শিশুদের নিয়ে শুয়ে আছেন, সেখানে একবার যাই। গিয়ে দেখি আমার তিনটি সন্তান—কারো মাথা এদিকে, কারো ওদিকে—সমস্ত খাটটি জুড়ে শুয়ে আছে। পাশের সংকীর্ণ স্থানটুকুতে ক্লান্ত দেহে পত্নীও কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলুম। কতকটা আমার অজান্তেই মন যেন অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। /আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' মশারিটি গুঁজে দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কবি যে এই অর্থে কথা ক'টি রচনা করেননি, সে কথা, বলা বাহুল্য মাত্র। তাহলেও বলব 'সোনার তরী' কবিতা পাঠ এঁর জীবনে সার্থক হয়েছে। ইনি যথার্থই কাব্যরসিক।

কিন্তু কাব্য বোঝা এক, কবিকে বোঝা আর। এখানেও কবি বলতে মহাকবিদের কথাই বলছি। অন্যবিধ মহাশক্তিমান পুরুষদের তুলনায়ও মহাকবিরা একটু বেশি

দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয়। মহাপরাক্রমশালী রাজা, দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা, যুগান্তকারী ধর্ম-প্রবর্তক—সকলের কথাই অল্পবিস্তর আমরা জানি ; জানি না শুধু আমাদের মহাকবিদের কথা। পূর্বোক্তদের কাজের একটা চাক্ষুষ রূপ আছে। তাঁরা জনসমাজ তোলপাড় করেন, তাঁদের জানা সহজ। কবি কাজ করেন নীরবে। তাঁর কাজটা চোখে পড়ে না, মনে ধরলেও ধরতে পারে কিন্তু তাতে প্রচুর সময় লেগে যায়। সেজন্যে দেখা যায় পৃথিবীর মহাকবিরা বহুলাংশে অজানাই থেকে গিয়েছেন। বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, এমন কি তাঁদের অনেক পরবর্তী কালের কালিদাসও আমাদের কাছে কিংবদন্তী মাত্র। এঁদের সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুক কাহিনী ছাড়া কিছুই আমাদের জানা নেই। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, শেক্সপীয়ার মাত্র চার শ' বছর আগের মানুষ। ষোড়শ শতাব্দী প্রাচীন যুগ নয়, মধ্য যুগও নয়, আধুনিক যুগ তখন এসে গিয়েছে। Brave new world এর আগমন বার্তা যিনি ঘোষণা করলেন সেই শেক্সপীয়ারই থেকে গেলেন তাঁর আপন যুগের কাছে অজানা অচেনা। এ এক বিরাট রহস্য।

রহস্যটা আসলে মানুষটির চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। প্রতিভাবানের প্রতিভাই একটি আড়ালের সৃষ্টি করে। গতানুগতিকের পরিচিত গণ্ডী ছড়িয়ে যেখানে সাধারণের অপরিচিত রাজ্য সেখানে প্রতিভার বাস। আবার প্রতিভাবান মানুষটি যদি হন কবি, তাহলে সে আড়ালটা আরোই ঘনীভূত হয়, মহাকবি হলে তো কথাই নেই। কারণ কবি মানুষটি বেশির ভাগ সময়ই আপনাতে আপনি মগ্ন। তিনি যে পরিমাণে আত্মমগ্ন আমরা সে পরিমাণে তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে মানুষ সদা চিন্তামগ্ন তাঁর চিন্তার বেষ্টনী ভেদ করে তাঁর মনের নাগাল পাওয়া বড় সহজ নয়। ইংরেজ কবি একেই বলেছেন—hidden in the light of thought. চিন্তার ঔজ্জ্বল্যই আমাদের চোখ মন ধাঁধিয়ে দেয়। কবিকে আড়াল করে রাখে।

সংসারের সবচেয়ে দুর্গম স্থান মানুষের মন ; সেজন্যে মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্য ; মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—প্রত্যেকটি মানুষ যেন একটি দ্বীপ, কোনটির সঙ্গে কোনটির যোগ নেই—মাঝখানে বিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশি। বাস্তবিক পক্ষে যে মানুষটি এ মুহূর্তে আমার পাশটিতে গা ঘেঁষে বসে আছে, মনের দিক থেকে হয়তো সে সহস্র যোজন দূরে। নিকটতম আপনজনও সুদূরতম মনোরাজ্যের অধিবাসী। এদিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত। এটি মানব সংসারের একটি অতি নির্মম সত্য।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মধ্যেই যদি অপরিচয়ের ব্যবধান হয় এতখানি, তাহলে অনন্য সাধারণ প্রতিভাবান এবং আমাদের মধ্যে ব্যবধান যে কী দুস্তর তা কল্পনা করাও কঠিন। প্রতিভাবান মানুষ—বিশেষ করে যাঁরা কবি শিল্পী—তাঁরা মনন রাজ্যের অধিবাসী। সে রাজ্যের পথঘাট—আমাদের ভালো জানা নেই। সেজন্যে ভাবনার রাজ্য ছেড়ে আমরা তাঁকে ঘটনার রাজ্যে খুঁজে বেড়াই। ঘটনার সঙ্গে জোটে এসে রটনা। ঘটনা আর রটনার অরণ্যে ভাবুক মানুষটি যান হারিয়ে। তাঁর ভাবনার সূত্রগুলো ঠিক ধরতে পারি না বলে তাঁর অনেক কথা আমরা ঠিক বুঝি না কিংবা ভুল বুঝি।

গোড়ায় যে কথা বলেছিলাম, ঋতুরাজের ন্যায় রসরাজও রহস্যাবৃত। মালতী মাধবীর ন্যায় আমাদেরও মন দ্বিধাগ্রস্ত—'কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা, কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।' রূপস্রষ্টা এবং রসস্রষ্টাকে বুঝতে হলে প্রচুর পরিমাণে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। শেক্সপীয়ার প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল লণ্ডন শহরে কাটিয়েছেন। একদিন লণ্ডনের পাট তুলে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। দুদিন বাদে ইহলোক ছেড়েই চলে গেলেন। সেদিনের লণ্ডনে অগণিত কবি, নাট্যকার। তাঁরা যে সে যুগের বৃহত্তম প্রতিভার সঙ্গে এক কাজে লিপ্ত ছিলেন, বলতে গেলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই বাস করেছেন, তা বিন্দুমাত্র তারা আঁচ করতে পারেননি। তার কারণ তাঁরা আমাদেরই মতো খুদে মনুষ্য, লেখক। মহাকবিকে অত কাছ থেকে দেখেও তাঁরা চিনতে পারেননি। চিনেছিলেন শুধু একজন। বেন জনসন সে যুগের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম। নাট্যকার হিসেবে শেক্সপীয়ার এবং জনসন সমগোত্রীয় ছিলেন না, দুজন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তথাপি শেক্সপীয়ার-এর অসামান্য প্রতিভাকে চিনে নিতে জনসন-এর বিলম্ব হয় নি। মহাকবির মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই বেন জনসন লিখেছিলেন— 'He was not of an age but for all time.' সে যুগের আর কোন ব্যক্তি এমন অভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেননি। কবি-কল্পনার জোরেই এটি সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী কালে ইংরেজ জাতি কবি শেক্সপীয়ারকে জানবার বুঝবার জন্য প্রশংসনীয় নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছে। শুধু কাব্য নয়, কবি মানুষটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা এখনও চলছে। কারণ অন্যান্য মহাকবির ন্যায় শেক্সপীয়ার সম্পর্কেও দুটি একটি কৌতুক কাহিনী ছাড়া কিছুই বড় একটা জানা ছিল না। বাল্যজীবন, শিক্ষাদীক্ষা, বন্ধুজন, দাম্পত্যজীবন, সুখেদুঃখে কিভাবে জীবন কেটেছে সামান্য এক-আধটু টুকরো-টাকরা ছাড়া কিছুই কারো জানা নেই। ঘটনাশ্রিত মানুষটা বেমালুম গিয়েছেন হারিয়ে। সে মানুষকে পেতে হলে ভাবতে হবে কি ধরনের মন এমন সব চরিত্রের সৃষ্টি করতে পারে, এমন সব কথা বলতে পারে, এমন সব ভাবনা চিন্তার আধার হতে পারে। সুকঠিন কাজ। ইংরেজ পণ্ডিতমহল সে কাজে অবিরাম নিরত।

এদিক থেকে রবীন্দ্রজীবনের আলোচনা অনেক সহজ। তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাই আমাদের জানা। আধুনিক যুগের কৌতূহলী দৃষ্টির সমুখেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। কবি-জীবন সাধারণত ঘটনাবহুল না হলেও রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম। বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। এক সময়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের impact সাত সাগরের কূলে কূলে ঢেউ তুলেছিল। সে ব্যক্তিত্বের মহিমা কত কত রাষ্ট্রনেতার শক্তিমত্তাকে মলিন করে দিয়েছে। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপীয় জনগণের কাছে শান্তির দূত হিসাবে রাজকীয় সংবর্ধনা লাভ করেছেন, অপর দিকে ক্ষমতা-গর্বী আমেরিকা এবং জাপানের শাসকগোষ্ঠী শত্রুজ্ঞান করেছে। ইংরেজ সরকার বিষ-নজরে দেখেছে, আবার দেশীয় নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনার দরুন দেশবাসীর বিরাগভাজন হতে হয়েছে। এত সব ঘটনা সত্ত্বেও বলব না, বড় হয়েছেন ঘটনাচক্রে। কবির কবি-স্বভাবটি তৈরি হয় অতি নিভৃতে, লোকচক্ষুর অগোচরে। সেখানে ঘটা করে কিছুই ঘটে না। লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে নিজের জীবন কথা লিখেছেন তাতে বলতে গেলে কোন ঘটনারই উল্লেখ নেই। অথচ

রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি ছিলেন না, কর্মীও ছিলেন। কিন্তু কর্মজীবনের কথা বলতে গিয়েও কর্মের পেছনে যে মনটা কাজ করেছে সে মনটার কথাই বলেছেন। সেই মনটিকে বুঝলে তবে মানুষটিকে বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ব্যক্তিবিশেষের বায়ুমণ্ডল। আপন বায়ুমণ্ডল থেকে আলাদা করে নিয়ে শুধু ঘটনা সংবলিত ব্যক্তিটিকে দেখতে গেলে মানুষটিকে ভুল বুঝবার আশঙ্কা থাকবে। ১৯২১ সালে যখন টমসন সাহেবের রবীন্দ্র-জীবনী প্রকাশিত হয় [E. (Edward) J. Thompson— *Rabindranath Tagore : His Life and Work*, Cal, 1921] তখন রবীন্দ্রনাথ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা (টমসনের গ্রন্থটি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত) একটি চিঠিতে এই ভাবটিই প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন—'টমসন তাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়—রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে এই অতি-স্ফুটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষের কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে তাহার সম্বন্ধ আছে—সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি নির্দিষ্ট নহে। আমার সেই সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান না।' কবে কখন কোন্ জিনিস তাঁর মনকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিল, হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করেছিল এবং আজীবন মনে যার অনুরণন অনুভব করেছেন, জীবনচরিতে সে সব কথার উল্লেখ থাকে না। কারণ এসব জিনিস ঘটা করে ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, সংসারের পরম আশ্চর্য ব্যাপারগুলি পরম নিঃশব্দে ঘটে।

সামান্য একটি কথার উল্লেখ করলেই জিনিসটা স্পষ্ট হবে। কিছুকাল আগে আমাদের একটি পত্রিকায় দীর্ঘ দিন ধরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা বাদ-প্রতিবাদ চলছিল। বিষয়টা কি ? না—রবীন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে হয়েছিল না মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা' দিয়ে হয়েছিল। কবিকে বুঝবার পক্ষে এসব প্রশ্ন শুধু যে অবান্তর এমন নয়, হাস্যকরও বটে। সাহিত্যরসিক মাত্রই জানেন যে কবির মন শুধু বই বড়ে তৈরি হয় না ; কবির পাঠ্য কেতাব সব সময় ছাপার অক্ষরে লেখা হয় না। কারণ কবি জানেন যে there are books in brooks and sermons in stones. আমরা যা দেখতে পাই না, কবি চোখ মেলে তাই দেখেন ; আমরা যা শুনতে পাই না, তিনি কান পেতে তাই শোনেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিটি কোথায় তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল, সে কথা তিনি নিজ মুখেই বলেছেন অতি সুন্দর করে,—'বাল্য বয়সের শীতের ভোরবেলা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রের অন্ধকার যেই পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে, আমি তাড়াতাড়ি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে একসার নারকেলের পাতার ঝালর তখন অরুণ আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বঞ্চিত হই সেই আশঙ্কায় পাৎলা জামা গায়ে দিয়ে বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যেতাম।....বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এই জন্যেই আমার আসা।' কবির বিদ্যারম্ভ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই ; জানি না যে কবির হাতেখড়ি আমাদের মতো হাত মকসো করে হয় না। সেই যে বালক বয়সে শীতের প্রভাতে শীতের কাঁপুনি উপেক্ষা করে প্রথম সূর্যালোকে নারকেল পাতার

সোনার ঝালর দেখতে ছুটে যেতেন, প্রকৃত বিদ্যারম্ভ সেই তখন হয়েছে। কবির বিদ্যারম্ভ এ ভাবেই হয়। সেখানে বর্ণপরিচয় বা শিশু শিক্ষার স্থান বড় কিছু নয়। কোন জিনিসের কতখানি মূল্য ঠিক বুঝে উঠতে পারি না বলে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবান্তর আলোচনায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় মোজা পরতেন কিনা সে বিষয়েও আমাদের পত্র-পত্রিকায় গুরুতর আলোচনা হতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুস্থতার সময়—অপারেশনের আগে পরে তাঁর শারীরিক অবস্থা—জ্বরটা কখন আসত কখন যেত, গায়ের তাপ কখন কত, রক্তের চাপ স্থির কি অস্থির, অন্যান্য উদ্বেগ উপসর্গ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ উপকরণ সংগ্রহ করে গবেষণা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এই যে সব দৃষ্টান্ত দিলাম এসব আমার মতে এক ধরনের পৌত্তলিকতা। এর মধ্যে মানুষের মূর্তিটাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে ; মানুষটির কোন পরিচয় নেই। এ জাতীয় রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা লেখক-সমাজ বা পাঠক-সমাজ কারো পক্ষেই গৌরবের কথা নয়।

তাই বলে তুচ্ছ জিনিসকে তাচ্ছিল্য করতে বলছি না। অতি সামান্য ব্যাপারেও অসামান্য ব্যক্তির অসামান্যতা জ্বলজ্বলে ঝলমলে হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্র-জীবনের অনেক রত্ন-কণিকা হারিয়ে গিয়েছে। বসওয়েল এর মাহাত্ম্য ওইখানে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—বিদ্যাসাগরের বসওয়েল ছিল না। আমাদের দুঃখ, রবীন্দ্রনাথেরও বসওয়েল ছিল না যদিচ প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল। অমিয় চক্রবর্তী এবং অনিল চন্দ দুজনেই যোগ্য ব্যক্তি। তাঁরা আমাদের অনেক কৌতুহল এবং জিজ্ঞাসা মেটাতে পারতেন। কিন্তু দুজনের একজনও তা করেননি। অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন, তাঁকে দেখে মনে হত তিনি দেব-লোকের অধিবাসী। 'কথায় হাসিতে বেশে ব্যবহারে একটি সহজ অলৌকিকত্ব তাঁকে ঘিরে রাখত—শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই দিব্য ভাব জেনেছি, কোনদিন তা প্রাত্যহিক পরিচয়ে ম্লান হয়নি।' দৈনন্দিন জীবনের এই যে দিব্য বিভার কথা তিনি বলেছেন, তার কোন বিবরণ কোথাও তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। যদি করতেন তাহলে সেটি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ হতে পারত। অনিল চন্দও অতিশয় সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও অনেক কিছু দিতে পারতেন কিন্তু দেননি। এই সূত্রে আরেকটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক সময়ে প্রতি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে উত্তরায়ণে একটি মজলিশ বসত। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ অধ্যাপক কর্মী অনেকেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন। কত রকমের আলোচনা যে হত, জটিল গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা। সেই সঙ্গে আবার হাসির গল্পও চলত। কিন্তু দেখা গেছে যে সব আলোচনার বিবরণ কেউ লিখে রাখেননি। কী মূল্যবান সম্পদ থেকে যে আমরা বঞ্চিত হয়েছি তা বলবার নয়।

পুঁথিগত রবীন্দ্রনাথকে জানবার চেষ্টা যতখানি হয়েছে, প্রতিদিনের রবীন্দ্রনাথকে জানবার চেষ্টা ততখানি হয় নি। প্রতিদিনের মানুষটিই পুঁথির পাতায় প্রতিফলিত। মানুষটিকে বুঝতে পারলে গ্রন্থের অনেক গ্রন্থি আপনি মোচন হয়ে যায়। মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যাঁদের কল্যাণে খানিকটা আমরা পেয়েছি তাঁদের কাছে আমরা যথার্থই কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রানী চন্দ এবং মৈত্রেয়ী দেবী। এক যুগের রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় (এখানেও রানী চন্দের হাত

অনেকখানি)। কোন কোন ভ্রমণে সহযাত্রিণী হিসাবে কিছু দিয়েছেন রানী মহলানবিশ। ইদানীং আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের লেখনীতেও কিছু পেয়েছি। তবে স্বীকার করতেই হবে আপন পবিচয় রবীন্দ্রনাথ যতখানি দিয়েছেন ততখানি আর কেউ নয়। আমি 'জীবনস্মৃতি' বা 'আত্ম-পরিচয়'-এর কথা বলছি না। বলছি 'ছিন্নপত্রে'র কথা। 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় রবীন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গ ছবিটি ফুটে উঠেছে এমনটি আর কোথাও নয়। মনের আনন্দে মনের কথা লিখে গিয়েছেন। একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস। স্বপ্নেও ভাবেননি এসব জিনিস একদিন ছাপার অক্ষরে সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে। একটি চিঠিতে প্রাণাধিক ইন্দিরাকে বলছেন—তোর কাছে মনটাকে যেমন ভাবে মেলে ধরতে পারি এমন আর কারো কাছে নয়। এই যে অন্তরতম প্রকাশ একেই বলব— essential Rabindranath. 'ছিন্নপত্র'র রবীন্দ্রনাথকে জানলে তবে খাঁটি রবীন্দ্রনাথকে জানা যাবে, চেনা যাবে। এ ছাড়াও আছে অগণিত চিঠিপত্র। এ যাবৎ এগারো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, আরো বহু খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। রচনাবলীর তুলনায় পত্রাবলীর পরিমাণ কিছু কম হবে না। শুধু আয়তনে নয় সাহিত্যিক মূল্যায়নেও কিছুমাত্র খাটো হবে না। অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন—তাঁর এ জাতীয় রচনা বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পদ। সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও এর সামাজিক এবং সাংসারিক মূল্য অপরিসীম। কত বিচিত্র বিষয়ের যে আলোচনা! প্রতিভার বহুমুখিতায় এর তুলনা মেলা ভার। গভীরতায় কৌতুকপ্রিয়তায় উজ্জ্বলতায় প্রাণময়তায় একমাত্র গীতবিতানের সঙ্গে তুলনীয়।

চিঠিপত্রে মানুষ যতখানি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ কাব্যে সাহিত্যে ততখানি নয়। অর্থাৎ পত্রাবলীর রচয়িতা এবং রচনাবলীর রচয়িতা ঠিক এক মানুষ নন। দুটি জিনিস সুরে স্বাদে স্বভাবে আলাদা বলে একই মানুষ দুই ভিন্ন রূপে দেখা দেন। চিঠির পাতায় যতখানি ধরা দেন, বই-এর পাতায় তার সিকি ভাগও নয়। আধুনিক সাহিত্য-নীতি নির্দেশনায় ধরা দেওয়াটা শিল্পরীতি বিরুদ্ধ। লেখক নির্বিকার দর্শক ; যা দেখছেন এবং দেখে যা বলছেন তার মধ্যে নিজেকে কোন মতেই জড়াবেন না। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটু সাবেকি ধরণের বলতে হবে। তিনি বলবেন, আমি তো শুধু চোখ দিয়ে দেখি না, মন দিয়ে দেখি। কাজেই আমার লেখায় আমার নিজের মনের কথা কিছু এসে যাবেই। সোজা কথায় সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ আত্ম-গোপনের বিশেষ চেষ্টা করেননি, নিজে থেকেই ধরা দিয়েছেন অর্থাৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বলতে গেলে সশরীরে বিদ্যমান। সেখানে তাঁকে চেনা কিছুই কঠিন ছিল না। যিনি নিজে থেকেই ধরা দিয়ে বসে আছেন, তাঁকে যে আমরা ধরতে পারিনি বা ঠিক ভাবে চিনতে পারিনি সেটা আমাদেরই বুদ্ধির দোষে বলতে হবে।

চিঠিপত্রে যে মানুষকে আমরা দিব্যি ঘরোয়া পরিবেশে পাই, রচনাবলীর গহন অরণ্যে সে মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেলি। চেনা জানা মানুষটি অকারণে অতিকায় হয়ে দেখা দেন ; সেজন্যে চেনাকেও অচেনা বলে মনে হয়। ছিন্নপত্রের লেখকটি যে কবি মানুষ, তার সাক্ষ্য প্রতি পাতায়। সেই মানুষই রচনাবলীতে আর কবি নন, মহাকবি। আবার শুধু মহাকবি বলেও খুশি নই, আমরা তাঁকে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ হিসাবে দেখতে চাই, কাজেই তাঁকে উপনিষদের ঋষি সাজতে হয়। গুরুদেব আখ্যাটিতে ব্যাপার আরোই ঘোরালো হয়েছে। অসাধারণত্বের সঙ্গে একটু

অলৌকিকত্বের মিশেল না দিতে পারলে আমাদের ঠিক মন ওঠে না। বঙ্কিমবাবু কত রসের কথা আমাদের শোনালেন। সমস্তই ব্যর্থ হল, আমরা তাঁকে ঋষি বানিয়ে ছাড়লাম। গান্ধীজী অতিশয় চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন—ইংরেজ শাসকবর্গ তো তাঁকে astute politician বলে স্বীকার করেছেন, কেননা তিনি তাঁদের যথেষ্ট ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু আমাদের চোখে গান্ধীজী রাজনীতিজ্ঞ নন, তিনি মহাতাপস, মহাত্মা। আমাদের ধারণা পঞ্চাশ কোটি মানুষের মুক্তিকামী-স্বাধীনতা-সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দেখলে মহাত্মার মাহাত্ম্য নষ্ট হত। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কি ভাবে দেখতে হয় তা আমরা এখনো শিখিনি। কবিকে গুরু বললে যে তাঁর গুরুত্ব বাড়ে না বরং কমে যায় এ কথা বোঝানো কঠিন, কারণ আমাদের লঘু-গুরু জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ নয়। গুরুগিরি ব্যাপারটাই কবি-ধর্মের বিরোধী। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন এবং কিছুমাত্র বুঝেছেন তাঁরাই জানেন যে কথনে, চিন্তনে, মননে জীবনে, অভ্যাসে বিশ্বাসে স্বভাবে, কোথাও এতটুকু গুরু-গিরির ছাপ তাঁর মধ্যে ছিল না। এ ছাড়া লোকে ক্রমে ভুলেও যাচ্ছে যে, গুরুদেব আখ্যাটি একান্ত ভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে আশ্রম বিদ্যালয়টি স্থাপিত হল। সেকালের আশ্রমে একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি বাস করতেন, অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীরা এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীরা তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। তিনি ছিলেন শিষ্য পরিজন সমেত সকলের গুরুদেব। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বসানো হল আশ্রমগুরুর পদে। বলা বাহুল্য ওই সম্বোধনটি শুধু ছাত্র এবং অধ্যাপকরাই তখন ব্যবহার করতেন, পরে অধ্যাপক-পত্নীরা এবং আশ্রমবাসী সকলে। আশ্রম-পরিবারের বাইরে এর ব্যবহার ছিল না। পরবর্তীকালে গান্ধী-নেহরুর কল্যাণে সম্বোধনটি সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করেছে। এখন তাঁর গুরুদেব পরিচয় কবি পরিচয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শিক্ষিত সমাজে যাঁরা আধুনিক ভাবাপন্ন তাঁরা এ জিনিসটাকে বরদাস্ত করতে পারেননি ; অভিযোগ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুদেব সেজে বসে আছেন। এটা যে স্বেচ্ছায় নয়, বলা যেতে পারে দশচক্রে ঘটেছে সে কথা অনেকের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ বহুবার আপত্তি জানিয়েছেন—আমাকে তোমরা গুরু বানিয়ো না, আমি গুরু নই। কিন্তু যত বেশি আপত্তি করেছেন গুরুবাদে, তত বেশি পাকা হয়েছেন। এটা আমাদের জাতিগত স্বভাব। গান্ধীজীও তাঁর মহাত্মা-আখ্যায় আপত্তি জানিয়েছেন কিন্তু তাতে তাঁর মাহাত্ম্য আরোই বেড়ে গিয়েছে। যাঁরা বড় হন, তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার কিছু নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

এই যে নানা জন নানা প্রশ্ন তোলেন, দোষ ত্রুটি ধরেন এটা কিছু খারাপ নয়, লক্ষণটা ভালই বলতে হবে। প্রমাণ হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লোকের কৌতূহল ফুরোয়নি, তাঁকে জানা শেষ হয়নি। জীবদ্দশায় আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক মস্ত বড় controversial figure. ধর্মে সমাজে সাহিত্যে রাজনীতিতে প্রচলিত মতবাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মতান্তর ঘটেছে এবং তাঁকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড বাদানুবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত হয়েছেন চল্লিশ বছরের অধিক কাল হল, কিন্তু সুখের বিষয় যে আজও তিনি controversial figure. আজও তাঁর সম্বন্ধে তর্কের অবসান হয়নি অর্থাৎ তিনি ফুরিয়ে যান নি। নানা দিক থেকে নানা ভাবে

তাঁকে যাচাই করে দেখবার চেষ্টা চলছে। আজকের দৃষ্টিতে কোন কোন দিকে হয়তো ঘাটতি দেখা যাবে, আবার কোন কোন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত কোন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। মহৎ কবির এই মহিমা—তিনি কখনো পুরোনো হন না। তাঁকে বারংবার নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। 'বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন'। ফাল্গুনীর অন্তিম পর্বে চন্দ্রহাস সর্দারকে বলছে 'মনে হচ্ছে যেন...তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম।' এখানে প্রথম অর্থে নূতন।

আমাদের ভয়েজ অব ডিস্‌কভারি যে এ যাবৎ আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করেনি তার কারণ আমাদের কম্পাসের কাঁটাটি ঠিক ভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদেরই যুগের এবং আমাদেরই সমাজের মানুষ, স্থান কাল পাত্র মিলিয়ে আমাদেরই একজন, এ কথাটা সহজভাবে আমরা মেনে নিতে পারিনি। পুরাকালের মুনি ঋষিদের আমরা চোখে দেখিনি। তাঁদের কল্প-মূর্তি আছে আমাদের মনে। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কান্তি মিলে গিয়েছে আমাদের কল্পলোকের ঋষি মূর্তির সঙ্গে। লোকে তাঁকে দেখে এতই অভিভূত হত যে, রবীন্দ্রনাথ বললে কি হবে—'আমি তোমাদেরই লোক'—লোকে তাঁকে আপনার জন বলে ভাবতেই পারেনি। একে ঋষি-কল্প-মূর্তি, মুখে উপনিষদের বাণী, শান্তিনিকেতন মন্দিরে ধর্মোপাসনা, তদুপরি গুরুদেব আখ্যা—সমস্তটা মিলিয়ে তাঁকে একজন ধর্মগুরু হিসাবে ভাবা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। ভেবেছেনও অনেকে। চিঠিপত্রে দেখা যায় বহু পত্রলেখক ধর্মীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তিনি সাধ্যমত সে সবের জবাবও দিয়েছেন। তবে আগে যা বলেছি, এখানেও তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি। প্রচলিত কোন ধর্মমতের সঙ্গেই তাঁর মিল নেই। কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ উভয়ের দ্বারাই তিনি প্রত্যাখ্যাত। মজার কথা এই যে ,ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং বেশ কিছু কাল আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি পদে কাজ করেও ব্রাহ্ম সমাজে তিনি অব্রাহ্ম বলে পরিচিত ছিলেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রশান্ত মহলানবিশের ভগ্নীর সঙ্গে সুশোভন সরকারের বিবাহ স্থির হল। বিবাহের পাত্র-পাত্রী রবীন্দ্রনাথের অতিশয় স্নেহের পাত্র-পাত্রী। খুব খুশি হয়ে বললেন—বিয়েটা আমিই দিয়ে দেব। শুনে বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা জানতেন যে 'অব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলে প্রবীণ ব্রাহ্মরা কেউ বিবাহে যোগদান করবেন না। অতএব প্রশান্তবাবু এসে কবিকে বললেন—আপনি আর কষ্ট করে কেন যাবেন ? রামানন্দবাবু আচার্যের কাজ করতে রাজী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—'বাঃ খুব ভাল কথা, রামানন্দবাবু হলে আর কথা কি ?' ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল। বললেন—'আমি তাহলে ত্রিপুরা থেকে একটু ঘুরেই আসি।' আগরতলায় চলে গেলেন। এ ব্যাপারে চাতুরিটুকু তিনি বুঝতেই পারেন নি। বিবাহের দিনে দুটি গান লিখে কনেকে আশীর্বাদ পাঠিয়ে ছিলেন। এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন স্বয়ং সুশোভন সরকার তাঁর 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' নামক বইটিতে। কৌতুকের কথা যে প্রশান্তবাবু এবং সুশোভনবাবু উভয়েই সব ব্যাপারে নিজেদের খুব Progressive ভাবতেন। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে প্রগ্রেসিভ মনের খুব একটা পরিচয় আছে কি ?

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত নিয়ে বই লেখা যত সহজ বিষয়টা বুঝে ওঠা তত সহজ নয়। খুব সংক্ষেপে এবং খুব সহজ করে বলতে গেলে—ভজন পূজন সাধন আরাধনা ছাড়িয়ে রিচুয়েল-মুক্ত মন নিয়ে যদি সৌন্দর্যানুভূতির চর্চা করা যায়, তাহলে বোধকরি রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের খানিকটা আঁচ আমরা করতে পারব। সেই সৌন্দর্যচর্চা হবে 'মনসা কর্মনা বাচা'—চিন্তায় কর্মে বাক্যে এবং ব্যবহারে যখন সুন্দরের ছাপ পড়বে তখন সেটা আর নিছক অ্যাকাডেমিক চর্চা থাকবে না, সেটা হবে আচরণ। ধর্ম বা ধর্মাচরণ বলতে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এইটুকুই বুঝতেন, এর বেশি খুব একটা কিছু নয়। মন্দিরে যখন ভাষণ দিয়েছেন তখনও চোখ বুজে ধ্যান করতে বলেননি। বলেছেন—"এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকতো তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করেছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্র-সূর্য খচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্ব-জগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করছে।"

তত্ত্বকথা বলেননি, এমন নয়। বলেছেন, কিন্তু খুব আলগোছে বলেছেন। শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন লৌকিক সামাজিক এবং সাংসারিক অর্থে অর্থাৎ নিত্যদিনের ব্যবহারের উপযোগী করে। ধর্মকে কালেভদ্রে ব্যবহারের জন্যে সিকেয় তুলে রাখেননি, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সর্বক্ষণের একটি মানসিক এবং আন্তরিক ক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন। সোজা কথায় তথাকথিত ধর্মের চাইতে ধর্মবোধের উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। যাঁরা বলেন, ধর্মের তত্ত্ব গুহার অভ্যন্তরে নিহিত, তাঁরা ভাববেন এসব হল ধর্মীয় সমস্যাদির অতিমাত্রায় সরলীকরণ চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ জিনিস সহজ বা সরল নয় ; বরং বিধি-বিধান অনুযায়ী ritualistic ধর্মপালনই এর চাইতে ঢের বেশি সহজ প্রক্রিয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্কের মধ্যেই ধর্মের যথার্থ প্রয়োগ এবং পরীক্ষা। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বলেছিলেন—'আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই।' এ কথা সেদিনও লোকে বোঝেনি, আজও ঠিক বোঝে এমন মনে করি না। বাস্তবিক পক্ষে এ ধর্ম বোঝা এবং কার্যত পালন করা বড় সহজ নয়।

ইদানীংকালে আবার একটা নতুন মতবাদের প্রচার হয়েছে। এঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে ছিলেন অতিমাত্রায় ভগবদ্ভক্ত এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে এসে তাঁর ভগবদ্ভক্তি এবং ধর্ম-বিশ্বাসে রীতিমতো চিড় ধরেছিল। এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। প্রথম যুগে ধর্মকথা যতখানি বলেছেন শেষ দিকে ততখানি বলেননি, কিন্তু তাই বলে তিনি শেষ জীবনে ধর্মচিন্তা ত্যাগ করেছিলেন কিংবা তাঁর মন ধর্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছিল এমন মনে করা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত অগণিত ব্রহ্ম-সংগীত বা ধর্ম-সংগীতের পশ্চাদ্‌ভূমিকাটি ভেবে দেখা সঙ্গত। পিতা মহর্ষিদেব ছিলেন প্রথম ব্রহ্মোপাসনা-মন্দির বা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সমাজের বিবিধ অনুষ্ঠানাদির রীতিপদ্ধতিও মহর্ষি-ই রচনা করেছেন। এক কথায় ব্রাহ্ম সমাজ-জীবনের তিনিই রূপকার। মন্দিরের উপাসনায় এবং বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে সংগীতের প্রয়োজন হয়েছে। মহর্ষি পুত্রেরা সকলেই গুণী ব্যক্তি, পিতার প্রেরণায় এক সময়ে প্রত্যেকেই ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই এ কাজে হাত লাগিয়েছিলেন।

এর মধ্যে খানিকটা অকালপক্কতা ছিল। ক্রমাগত গুরুগম্ভীর এবং ওজনে ভারী কথা বলাটা কবিস্বভাবের অনুকূল নয়। ওই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনে মস্ত বড় একটা ফাঁড়া গিয়েছে বলতে হবে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজে নিয়োজিত হলে প্রতিভার প্রখরতা বিনষ্ট হতে পারে। মনে মজ্জায় কবি ছিলেন বলেই সে দুর্দৈব ঘটেনি। রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে তাঁর পূজা পর্যায়ের অনেক গান প্রেম পর্যায়ের অন্তর্গত হতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বলেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনে হাওয়া তৈরি করিয়াছে।' উপনিষৎ তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি। কাজেই তাঁকে যদি উপনিষদের ঋষি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয় তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করাই হবে। অপর পক্ষে কেউ যদি বলেন জীবনের শেষ পর্বে উপনিষদের প্রভাব তাঁর উপর স্তিমিত হয়ে এসেছিল কিংবা ধর্মের উপরে তিনি আস্থা হারিয়েছিলেন তাহলে ঠিক গ্রহণযোগ্য বলা যাবে না। এক সময়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ কোন কোন রবীন্দ্র-অনুরাগী রবীন্দ্রনাথকে অত্যাধুনিক প্রমাণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের মতে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হল ধর্ম-বিমুখতা। আমাদের জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার অগ্রদূত। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মকথা বলেন, উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন সে হেতু এঁরা তাঁকে একটি 'মডার্ন প্রিমিটিভ' বলে মনে করতেন। এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্যই একটা মন-গড়া ধর্মবিমুখতা তাঁর উপরে আরোপ করা হয়েছে। দোষে গুণে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষটা যা, তাই দিয়েই তাঁকে জানতে হবে। আমার পছন্দমত ছাঁট কাট করে দেখলে তা চলবে না। আমার ধ্যান-ধারণা তাঁর ঘাড়ে চাপাতে গেলে তিনি আর রবীন্দ্রনাথ থাকবেন না। একবার কলকাতায় এক সাহিত্য-বাসরে একটি প্রবন্ধ পাঠ শুনেছিলেম। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের মোহ-মুক্তি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ধর্মের মোহ কাটিয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা। প্রবন্ধ-রচয়িতা সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। তাঁর বক্তব্য তিনি সুন্দর করেই বলেছিলেন কিন্তু বক্তব্যের সমর্থনে যে সব তথ্য এবং দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না। দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডার থেকে। 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' গানটি সুপরিচিত। প্রবন্ধকার এই গানটির উল্লেখ করে বলেছিলেন—পিতা নোহসির তরীটি ডুবে গেল। খুব বিস্মিত হয়েছিলাম, আপনারাও হবেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে পূর্বোক্ত সংগীতটি 'চিরকুমার সভা' নাটকের একটি গান। 'চিরকুমার সভা' একটি প্রহসন। সেখানে ধর্মীয় আলোচনার কোনই অবকাশ নেই। গানটি সম্পূর্ণ অন্য সূত্রে, অন্য অর্থে রচিত। আরেকটি কথাও লক্ষণীয়। 'চিরকুমার সভা' রচিত হয়েছে ১৩৩২ সালে। সেটা তাঁর জীবনের শেষ পর্ব নয়। বয়স ষাটের কোঠায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত মতাবলম্বীদের মতে তখনও পিতা নোহসি-তেই তাঁর ডুবে থাকবার কথা। সোজা কথায় 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' গানটির যে ব্যাখ্যাটি প্রবন্ধকার দিয়েছিলেন সেটি যুক্তির জোরে নয়, গায়ের জোরে দেওয়া। নাটকটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মের লেশমাত্র সংস্রবও নেই; কাজেই পূর্বোক্ত গানের তরীটি অকারণে কেন পিতা নোহসির তরী হতে যাবে সে আমার বুদ্ধির অগম্য। এ প্রবন্ধের গোড়ায় আমি বলেছি

যে, কবি যে অর্থে লিখেছেন সেটাই কবিতার একমাত্র অর্থ নয়। যে অর্থটি পাঠকের মনে ধরেছে সে অর্থেই কবিতাটি তার কাছে সার্থক। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোনার তরী' কবিতাটির উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু এটা হল রসানুভূতির কথা। ধর্মের মধ্যেও রস আছে। তাহলেও বলব, ধর্ম প্রধানত বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন। আমার অবিশ্বাস দিয়ে অপরের বিশ্বাসকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। উক্ত প্রবন্ধকারের ন্যায় আমিও ধর্মধ্বজী ব্যক্তি নই। ধর্মকথায় আমারও খুব একটা রুচি নেই। কিন্তু তাই বলে আমার পছন্দ অপছন্দ তাঁর ঘাড়ে চাপাতে যাব কেন? গোড়ার দিকের চাইতে শেষ দিকে ধর্মকথা কম বলেছেন, ধর্মসংগীত রচনা খুবই কম করেছেন, কিন্তু তাই বলে ধর্মে তাঁর আস্থা কমে গিয়েছিল, এরূপ ভাবলে খুব ভুল করা হবে। অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখেছেন চতুর্দিকে। গভীর বেদনা এবং তীব্র ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে নানা রচনায় কবিতায়। কিন্তু তাকে ধর্মে অনাস্থা বা সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমানের প্রতি অবিশ্বাসের লক্ষণ বলা চলে না। মিল্টন এর On the late massacre in Piedmont নামক সনেটে যেমন indignation- এর প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও তাই। মিল্টনকে যেমন কেউ ধর্মবিমুখ বলবে না, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তেমন কিছু ভাববার কোন হেতু দেখি না।

এক দল যেমন রবীন্দ্রনাথকে যুগোপযোগী আধুনিক প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে ধর্ম-বিমুখ করে ছেড়েছেন তেমনি অপর এক দল আবার বলতে চেয়েছেন যে অনেক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলতে পারেন নি। অর্থাৎ তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ছিলেন না। এঁরা মার্কসপন্থী; এঁদের মতে মার্কসবাদে আস্থাই আধুনিকতার চূড়ান্ত প্রমাণ। তাঁরা স্বভাবতই মার্কসবাদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিচার করেছেন। আপত্তির কিছুই নেই; ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটা মূল্য আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকে মিলিয়ে নিরপেক্ষ পাঠক সমগ্রের একটা আভাস পেতে পারেন। তবে এখানেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে। কোন মতবাদ যদি একবার পেয়ে বসে তাহলে মনকে এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। দেখাটা একটু অধিক মাত্রায় এক দিক ঘেঁষে একপেশে হয়ে যায়।

ভুললে চলবে না যে ভাবনাটা এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষকে নিয়ে। প্রথমে প্রতিভা জিনিসটাকেই ভালো করে বুঝে নিতে হবে। ওর স্বভাবটা একটু বেয়াড়া, ঠিক বশংবদ প্রকৃতির নয়। বিধিনিষেধ মানে না, নিয়ম মেনে চলে না। আপন খেয়াল খুশি মতো চলে। শেক্সপীয়ার এর বেলায় আমরা দেখেছি যে সেদিনের অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ডিগ্রীধারী কবি নাট্যকারের দল অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছেন—আরে ছ্যা ছ্যা, ও লিখবে কি? লেখাপড়া জানে না, অ্যারিস্টটল্ পড়েনি। অ্যারিস্টটল্ নাট্যরচনার যে ছক বেঁধে দিয়েছেন ও পদে পদে তা লঙ্ঘন করেছে। অশিক্ষিত লোকগুলো না জেনে না বুঝে ওকে নিয়ে আজ হৈ চৈ করছে বটে কিন্তু দেখে নিয়ো, দুদিন পরে ওর নাটক কেউ ছুঁয়েও দেখবে না। তবেই দেখুন অ্যারিস্টটল্ মতে যাচাই করতে গিয়ে সেদিনের পণ্ডিত-সমাজ শেক্সপীয়ারকে হারিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে শেক্সপীয়ার এর প্রতিভা অ্যারিস্টটল্‌কে ডিঙিয়ে চলে গিয়েছিল। মার্কসীয় দৃষ্টিতে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা রকম ঘাটতি দেখা দেবে। ঘাটতির হিসাব করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাতছাড়া হয়ে

যাবেন। শেক্সপীয়ারকে শেক্সপীয়ার হিসাবে, রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ হিসাবে দেখলে তবেই তাঁদের স্বধর্মে দেখা যাবে। পরধর্মে দেখতে গেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। শেক্সপীয়ার অ্যারিস্টটল্-এর মন যুগিয়ে চলেননি ; রবীন্দ্রনাথকে মার্কস-এর মন যুগিয়ে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যিই বা কে দিয়েছেন ? কবি-মানুষ একমাত্র রসের দাবি ছাড়া অন্য কোন দাবি মানতেই বাধ্য নন। দোষক্রটি শেক্সপীয়ার-এরও ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও আছে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে দোষ যত সহজে ধরা পড়বে, রস তত সহজে নয়। মার্কসবাদ সমাজবিজ্ঞানের শাস্ত্র, রসজ্ঞানেব শাস্ত্র নয়। শিল্প সাহিত্য কোন মতবাদকে প্রশ্রয় দেয় না, দিলে সে নিজেই পঙ্গু হয়। বিশেষ কোন মতবাদকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি কিংবা রসালোচনা করতে গেলে সেটা কখনো খুব উঁচু দরের জিনিস হবে না। ইদানীং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু রবীন্দ্রালোচনা চোখে পড়েছে। সত্যি বলতে কি, মনে হয়েছে এ যেন রসটা নিংড়ে ফেলে দিয়ে ছোবড়া চিবানোর মতো। মনে রাখতে হবে যে কবি-শিল্পীরা প্রচারক নন, শিক্ষক বা উপদেষ্টাও নন। তাঁরা আনন্দস্রষ্টা এবং আনন্দদাতা, তাঁরা আনন্দ বিলিয়ে বেড়ান। লাভালাভের ভাবনা নিয়ে গেলে ঠকতে হবে, সুনির্দিষ্ট কিছুর জন্য হাত বাড়ালে শূন্য হাতে ফিরতে হবে। তাঁরা মুঠো ভরিয়ে দেন না, মন ভরিয়ে দেন। কবির মন বাতাসের মত সর্বত্রগামী। বাতাস সদ্য ফোটা ফুলটিকে আদর করে যায়, পাখির কুলায়টিকে দুলিয়ে দিয়ে যায়, নদীর বুকে ঢেউয়ের নাচন লাগায়, বনে বনে মর্মর ধ্বনি জাগায়। নদী অরণ্য পাখি ফুল বিভ্রান্ত হয়ে বাতাসকে বলে—তুমি কি যে আমাদের বলে যাও আমরা ভালো করে তা বুঝি নে। বাতাস হেসে বলে—'আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ/আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজো।' কবিও ঠিক এই কথাই বলেন। তিনি আমাদের মনের কথা জানেন। তাঁর কাছে কাজের কথা শুনতে গেলে নিরাশ হতে হবে।

কোন মতবাদকে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে এক ধরনের গোঁড়ামি এসে যায় এবং ক্রমে কুসংস্কারে পরিণত হয়। এরও দৃষ্টান্ত দেখেছি। বছর তিনেক আগে খুব ঘটা করে একটি উৎসবের আয়োজন হল। উপলক্ষটা কী ?—না, রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি। রবীন্দ্রনাথ কত কত দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, বলতে গেলে গোটা পৃথিবীই পরিক্রমা করেছেন কিন্তু একমাত্র রাশিয়া ভ্রমণটিকেই বেছে নিয়ে তাঁর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকেছিল। ভাবটা যেন, রবীন্দ্রনাথ তো সারা জীবনে তীর্থধর্ম করেননি ; ওই একটি বার মাত্র সোভিয়েত-ভূমি পর্যটন করতে গিয়ে তীর্থদর্শন এবং পুণ্যার্জন দু-ই একসঙ্গে সমাধা করেছেন। অতএব এটিই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই মনোভঙ্গি নিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কিছু-মাত্র বোঝেননি বা চেনেননি। রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন কৌতূহল। দেশে দেশে কোথায় কি ঘটছে—মাবনব সংসারে কোথায় কোন নতুন চিন্তা,—নতুন উদ্যোগের সূচনা হয়েছে—সে সব জানবার দেখবার জন্যে অসীম তাঁর আগ্রহ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ কৌতূহল তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র পূর্বে বলেছেন—'দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—/মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু/কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু/রয়ে গেল অগোচরে।' এ মানুষ সম্পর্কে যদি ভাবা হয়, পুণ্যভূমি সোভিয়েত ভূমি দর্শনের পরে সংসারে দর্শনযোগ্য আর কিছু

থাকতে পারে না, কেননা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখা হয়ে গিয়েছে—তাহলে বলতে হবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও মর্যাদা দেননি, মার্কস লেনিনকেও না। এ হচ্ছে এক ধরনের পৌত্তলিকতা। এঁরা জানেন না যে, এ সব অনন্য চরিত্রের মানুষ, অন্তবিহীন পথের পথিক।

রবীন্দ্রনাথ কত দেশ ভ্রমণ করেছেন ; যখন যেখানে ভাল কিছু দেখেছেন তারই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন দেশবাসীর কাছে চিঠিপত্রে কিংবা প্রবন্ধে। রাশিয়ার ন্যায় বিরাট দেশে জন-জীবনকে ঢেলে সাজাবার যে বিপুল আয়োজন চলছিল তা দেখে তিনি উল্লসিত। মুক্তকণ্ঠে তার গুণ-কীর্তন করেছেন। তবে কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় যতখানি মুক্তকণ্ঠ, কর্মপন্থার ব্যাপারে ততখানি নন। মার্কসতত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য নেই। সুশোভন সরকার মশায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে রাশিয়ান সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে এলেন কিন্তু কি উপায়ে সেই দুঃসাধ্য সাধন সম্ভব হল, সে বিষয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন নি, অর্থাৎ কিনা মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবটিকে ঠিক ভাবে বুঝে নিলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকতো না। ধর্মের বেলায় যেমন শাস্ত্রগত এবং সম্প্রদায়গত কোন ধর্মমতের সঙ্গে নিজেকে মিলাতে পারেননি তেমনি রাজনীতি এবং সমাজনীতির ব্যাপারেও কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি আমল দেননি। কোন প্রকার 'ইজম্'-এই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ধর্ম যেমন একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব অনুভূতিতে নিজের মনে গড়া—তেমনি তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিতে তিনি সমাজ সংগঠনের একটি ধারা নিজের মত করে উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লব যখন ঘটেনি, মার্কসবাদের নামও যখন এ দেশের লোক শোনেনি, তখনই তিনি শান্তিনিকেতনে একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল না—পদমর্যাদায় সকলেই সমান। বেতনের তারতম্য যৎসামান্য, সকলেই একই ভাবে কিংবা একই রকম অভাবে থাকতেন। নিজ নিজ কাজ—ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে কাপড় কাচা—বাসন মাজা সব কাজই সকলে নিজ হাতে করতেন। এই যে স্বল্পপরিসরে একটি সম-সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল সেটি ছিল সম্পূর্ণরূপে আনন্দ-জাত। এই কাজই সুবৃহৎ আকারে করতে গেলে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়, বলপ্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। ফলে সাম্যবাদের সাম্যটা বহুলাংশে বাদ পড়ে যায়। ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী আজ্ঞাকারী, বাদ বাকি সব আজ্ঞাবহ। রবীন্দ্রনাথ কোন ব্যাপারে কখনো কারো উপরে জোর খাটাতে যাননি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে, কোন আইডিয়াকে ঘিরে যখন একটি শাস্ত্র রচনা হয় এবং সেই শাস্ত্রটিকে ঘিরে যখন একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তখন সেটি ধর্মের আকার ধারণ করে। যেখানে ধর্ম সেখানেই দ্বন্দ্ব, যেখানে শাস্ত্র সেখানেই রক্ষাকবচ অস্ত্র, যেখানে সম্প্রদায় সেখানে সম্প্রীতি রক্ষা করাই দায়। রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলেছেন—শুভকার্য শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবে। দলগত বুদ্ধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বুদ্ধি, শুভবুদ্ধি কদাচিৎ।

কাজ দিয়ে বিচার। রাশিয়ান নবীন উদ্যম তাঁকে মুগ্ধ করেছে। মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাননি। দেখেছেন যে, মতবাদের বিবাদে অনেক শুভ সংকল্পও বরবাদ হয়ে যায়। দেশের রাজনীতিতেও কাজের কথাই সর্বাগ্রে বলেছেন। যখন দেখেছেন নেতৃবৃন্দ

কাজের চাইতে কথায় দড়, তখনই রাজনীতি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিকে ছাড়লেও রাজনীতি তাঁকে ছাড়েনি। এও খুব স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। কারণ দেখা গিয়েছে, কোন দেশের যিনি মহাকবি তিনি দেশের বা জাতির কোন ব্যাপারেই উদাসীন থাকতে পারেন না। কবির মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলেই যে কোন গুরুতর ব্যাপারে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হন এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে না। বহু সংকট মুহূর্তে দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের মুখপানে তাকিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ লাভের জন্যে। অবস্থাভেদে কখনো শাসকবর্গকে ধিক্কার দিয়েছেন, কখনো দেশীয় নেতৃবৃন্দকে সমালোচনা করেছেন কঠোর ভাষায়। ফলে দেশী বিদেশী কারোই মন পাননি। ধর্মের ন্যায় রাজনীতিতেও তিনি controversial figure. ধর্মের বেলায় হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের যেমন বিরাগভাজন ছিলেন, রাজনীতিতে তেমনি অপ্রিয় সত্য বলার দরুণ ইংরেজ ভারতবাসী কাউকেই তুষ্ট করতে পারেননি। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র গান্ধীজী বিরোধকেও যথার্থ মূল্য দিয়েছিলেন। The great sentinel আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন—তিনি আমাদের ভুল চুক ধরিয়ে দেবেন, ঠিক পথের নিশানা দেবেন।

রবীন্দ্রনাথকে যে বহু ব্যাপারে ভুল বোঝা হয়েছে তার মূল কারণটি হল, জীবনের প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলিতে প্রচলিত ধ্যানধারণাকে তিনি বারে বারেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। প্রচলিতকে ছেড়ে অপ্রচলিতকে মেনে নেওয়া সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। ধর্মের কথা আগেই বলেছি। হিন্দু ব্রাহ্ম দুই সম্প্রদায়ই বিভ্রান্ত—ফেলতেও পারেনি, গিলতেও পারেনি। তিনি যখন বললেন তাঁর ধর্মবোধ দেবলোক থেকে মানবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে তখন লোকে তা বুঝতে পারেনি, ভেবেছে তিনি দেবধর্মে অবিশ্বাসী। রাজনীতিতেও সেই ব্যাপারই ঘটেছে। দেশ পরাধীন, জাতীয় আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সকল দেশেই আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে স্বাজাত্যবোধের চর্চা খুব প্রবল বেগে শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওই উৎকট জাতীয়তাবাদের প্রচার আর কিছু নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব। কাজেই ওই সময়টিতে শান্তিকামী রবীন্দ্রনাথ যখন কঠোর ভাষায় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন, তখন দেশে বিদেশে সর্বত্রই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শক্তি-ধর্ম জাতিসমূহ—বিশেষ করে আমেরিকা জাপান খড়্গহস্ত। দেশবাসীও অসন্তুষ্ট, বলতে লাগল, তিনি যতখানি বিশ্ব-প্রেমিক ততখানি স্বদেশ-প্রেমিক নন। অপর একটি ব্যাপারে তাঁর মতামত খানিকটা ট্র্যাজিক আয়রনি হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিলেন। যেসব বীর যুবক অকাতরে প্রাণ দিচ্ছিলেন তাঁদের আদর্শবাদ এবং নির্ভীকতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন যে এঁরাই দেশের যুবশক্তির শ্রেষ্ঠ অংশ ; এঁদের অকাল মৃত্যু দেশের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, এই যুবক দলের প্রধান প্রেরণাদাতা তিনি নিজে। এঁরা সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়েছেন, তাঁর গান গাইতে গাইতে ফাঁসির মঞ্চে পা বাড়িয়েছেন। পরিহাসের পরিসমাপ্তি এখানেই হয়নি। 'চার অধ্যায়' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে অন্তু এলা নামে দুই অতি উজ্জ্বল উজ্জ্বলা যুবক যুবতীর চরিত্র হৃদয়ের অনেকখানি দরদ দিয়ে রচনা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে এমন মূল্যবান

দুটি প্রাণ জীবনের যথার্থ চরিথার্থতা থেকে বঞ্চিত হল—এরূপ ইঙ্গিত ছিল বলে সন্ত্রাসবাদীরা—আজীবন যিনি তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁর উপরে বিষম রুষ্ট হলেন। রবীন্দ্র-বিরোধী এক দল এর সুযোগ নিয়ে বলে বেড়াতে লাগল যে, সন্ত্রাসবাদীদের নিরস্ত করবার জন্যে ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ওই বইটি লিখিয়েছেন। ট্র্যাজিক আয়রনি আর কাকে বলে ! এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে না চেনার ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কি করা সম্ভব আর কি করা সম্ভব নয়, সে বোধ যদি থাকতো তাহলে এমন কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করতে পারত না। বলা বাহুল্য এ কলঙ্ক রবীন্দ্রনাথের গায়ে লাগেনি, লেগেছে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের গায়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গান্ধীজী বরাবর সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন। একবার ইংরেজ সরকারের অনুমতি ক্রমে তিনি জেলখানায় গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদের নিবৃত্ত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন অপবাদ প্রচার করা হয়নি। গান্ধীজীর বেলায় বাঙালি সমাজ যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা দেয়নি।

জীবনে সব চেয়ে বেশি ভেবেছেন বলেছেন লিখেছেন শিক্ষা বিষয়ে। শুধু বলে আর লিখেই ক্ষান্ত হন নি, হাতে কলমে কাজও করেছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। পরে সেই বিদ্যালয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হল। শুধু শিক্ষা-চিন্তা নয়, তাঁর সাহিত্য-চিন্তা, শিল্প-চিন্তা, ধর্ম-চিন্তা সমস্তই শান্তিনিকেতনকে আশ্রয় করে। শান্তিনিকেতন নামটা মহর্ষির দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ যে দিন বিদ্যালয়টি স্থাপন করলেন সেদিন অকস্মাৎ শান্ত নির্জন আশ্রম প্রাঙ্গণ কিশোর কণ্ঠের কলরবে মুখরিত হল। শান্তিনিকেতন হল আনন্দ-নিকেতন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে আনন্দে। আনন্দেই তার জীবন ধারণ, আনন্দে তার জীবন যাপন। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে শিক্ষা ব্যাপারটাকে সাধারণত একটা কৃচ্ছ্র-সাধনের আকার দেওয়া হয়। কবি-মনের স্পর্শে শিক্ষার তিরিক্ষি মেজাজ মোলায়েম হল, গোমরা মুখে হাসি ফুটল। সকাল বিকেল ক্লাস বসত। পড়ার কাজ ক্লাসেই শেষ। হোম টাস্ক এর নামে ইস্কুলের জের ঘরে টানা হত না। সন্ধ্যাবেলায় বিনোদন পর্ব। মাস্টার মশায়রা ছেলেদের নিয়ে গল্পের আসর জমাতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসে ছেলেদের সঙ্গে গল্প করেছেন ; কোন দিন বসেছে গানের আসর। নতুন নতুন গান লিখেছেন আর ছেলেদের এসে শিখিয়েছেন। কখনো নানা রকম বুদ্ধির খেলা উদ্ভাবন করতেন, ছেলেরা খুব মজা পেত। এ ছাড়া খেলাধুলার জন্য মস্ত বড় মাঠ ছিল, সেখানে সব রকম খেলারই ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ বিদ্যাদানের আয়োজন যতখানি, বিনোদনের ততখানি। প্রধানত ছেলেদের আনন্দের জন্যেই একে একে নানাবিধ উৎসব পার্বণের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি উৎসবের জন্যে রচিত হয়েছে নতুন নতুন গান, ছেলেদের অভিনয়ের জন্য নাটক প্রহসন, সপ্তাহে সপ্তাহে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ করে মন্দিরের ভাষণ। সমস্তটা মিলিয়ে দেখা যাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা যেন উৎসবের আয়োজন। এই সঙ্গে লক্ষ করবার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা শিল্প-চিন্তা ধর্ম-চিন্তা বহুলাংশে শান্তিনিকেতন দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে যতখানি প্রেরণা যুগিয়েছেন, শান্তিনিকেতন ততখানি যুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ যদি মহাকবি, শান্তিনিকেতন এক মহাকাব্য। এই মহা

সত্যটি আজ আর কারোই মনে নেই। শান্তিনিকেতনকে না বুঝলে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বোঝা কখনই সম্ভব নয়। বোঝা খুব সহজ এমন কথা বলছি না। রবীন্দ্রনাথ সাধে বলেছিলেন—হায়রে দূরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী তা কারো কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। তিনি নিজেই বোঝাতে পারেননি, আজ আর কে বোঝাবে? অপরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমরা যারা শান্তিনিকেতনে বাস করি, আমরাই কি শান্তিনিকেতনকে বুঝেছি? শুধু এখনকার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর সহযোগী হিসাবে এখানে বাস করেছেন তাঁরাও কি শান্তিনিকেতনকে এবং রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝেছিলেন? বিদ্বান পণ্ডিত অনেক ছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তখনও রবীন্দ্রনাথের মনে এই দুঃখ ছিল যে শান্তিনিকেতন কর্মীরাও তাঁকে ঠিক ভাবে জানবার বুঝবার চেষ্টা করেনি। ১৯২৯ সালে একটি চিঠিতে লিখছেন—'পৃথিবীতে সবচেয়ে যেখানে আমার যথার্থ পরিচয় ও রচনায় আলোচনা কম সে হচ্ছে শান্তিনিকেতন।' পরীক্ষা পাশের তাগিদে এবং ডিগ্রীর লোভে রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে পরিচয়টা হয়তো একটু বেড়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে তিনি যে জীবনটি গড়ে দিয়েছিলেন তাকেই অন্যত্র আমি বলেছি— applied Rabindranath. ওই জীবনটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল অতি সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা। সে লিখন ধুলায় হয়েছে ধুলি। আজ আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সে জীবনটিকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে এমন অবস্থায় আনা হয়েছে যে আজ তাকে শান্তিনিকেতন বলে চেনাই মুশকিল। আজকের শান্তিনিকেতন-জীবন দেখলে কেউ বলবে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোন ব্যক্তি কোন কালে এখানে বাস করেছেন।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কিছু লোক তন্মুহূর্তে লেগে গেলেন এটিকে ঢেলে সাজাবার জন্যে। ভাবটা যেন এটি এখন আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বভারতী। সরকারের কোনও দোষ ছিল না, তাঁরা কখনো কর্তৃত্ব ফলাতে আসেননি। বরং নেহরু গোড়া থেকেই এবং এই শান্তিনিকেতনে এসেই বারংবার বলেছেন—তোমরা অপরের দিকে তাকিয়ো না, এতদিন যে কাজ যেভাবে করে এসেছিলে সেভাবেই করে যাবে। নেহরু বললে কি হবে, সকলেই সহজ পন্থা খোঁজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মামুলি ছক আছে, সেটার মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে নিশ্চিন্ত। কিছু নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে হবে না। সমান পথে, নিয়ম মতে চললেই হবে। যিনি দপ্তরখানায় প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার দেখে দেখে এখানকার জন্য নিয়ম বিধি প্রণয়ন করতে লাগলেন। আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, এ সব জিনিস শান্তিনিকেতন জীবনের সঙ্গে এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আদৌ খাপ খাবে না। ভদ্রলোক বাইরে থেকে এসেছেন—শান্তিনিকেতন-জীবনটা যে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ সে কথা তাঁর পক্ষে বোঝা খুব সহজ ছিল না। তিনি ওটাকে আমলই দিলেন না। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বললেন—আপনাদের যা ব্যবস্থাদি দেখছি এ সব কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, কোথাও এ সব থাকে না। হতাশ হয়ে বলেছিলাম—কোন বিদ্যালয়ে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোথাও কখনো যা ছিল না তাই দিয়েই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাস বলা নিষ্প্রয়োজন।

দশের মতো হতে গেলে যেই দশা হয় বিশ্বভারতীর আজ সেই দশা হয়েছে। পরেরটা দেখে দেখে পরের মতো হওয়া খুব সহজ কিন্তু একান্তভাবে নিজের মতো হওয়া বড় কঠিন। সেখানে চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার পর থেকে এ দুই-এর নিতান্ত অভাব ঘটেছে বিশ্বভারতী পরিচালনায়। ভাবনা চিন্তা কল্পনা সমস্তই চাপা পড়েছে ফাইলের তলায়। গতানুগতিক কাজের নাম দিনগত পাপক্ষয়। বর্তমান বিশ্বভারতীর কাজ প্রকারান্তরে দিনগত রবীন্দ্রক্ষয়। রবীন্দ্রনাথের মন চিরনবীন। গতানুগতিকের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। এখন সেই গতানুগতিকের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে মারা হচ্ছে যা কিছু করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। পরীক্ষা জিনিসটাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন না বরং একটা প্রতিবন্ধক হিসাবেই দেখতেন। এ জন্যে তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার কোন স্থান ছিল না। সহযোগীরা বলেছিলেন—পরীক্ষা পাশের ছাপ না পেলে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের এখানে পাঠাবেন না। রবীন্দ্রনাথ অগত্যা রাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপদটাকে ঘরে ঢুকিয়ো না। পড়াশোনাটা এখানে হোক্, পরীক্ষাটা দিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহুদিন ধরে তাই চলে আসছিল। বাইরে থেকে আসা পরীক্ষাটা ঠিক অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারেনি বলেই এখানকার শিক্ষাধারায় এবং নিত্যদিনের জীবনধারায় তেমন কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয় যেই না সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হল অমনি তার রকম-সকম সব গেল বদলে। হঠাৎ সাব্যস্ত হল যে পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষা হয় না। বিশ্বভারতীর পরীক্ষা-নিরপেক্ষ শিক্ষা এখন বলতে গেলে পরীক্ষা-সর্বস্ব। সংবৎসর পরীক্ষা চলছে—মনে হয় with vengeancc. ভাবটা যেন রবীন্দ্রনাথ তো জীবনে কোন পরীক্ষা পাশ করেননি, কাজেই পরীক্ষার মর্ম তিনি বোঝেননি। অতএব কষে পরীক্ষা চালাও, শিক্ষাটা পাকা হবে। এমন কথাও বলতে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। সে জন্যেই এমন সব অবাস্তব কথা বলেছেন। অথচ যাঁরা খবর রাখেন তাঁর জানেন যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় যখন স্থাপন করেন তখন অকুণ্ঠ স্তুতি লাভ করেছিলেন স্বয়ং মাদাম মন্টেসরির কাছ থেকে। পরে যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল তখন রবীন্দ্র প্রবর্তিত শিক্ষারীতির উদ্দেশে অভিনন্দন বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ জন ডিউর বক্তৃতায় এবং প্রবন্ধে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, অলডাস্ হাক্সলিও একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন জীবন এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষা এ দুটি জিনিসকেই রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে বড় মূল্য দিয়েছিলেন। সব চেয়ে ব্যর্থ হলেন সেইখানেই। মস্ত বড় একটা জিনিসকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অতিশয় তুচ্ছ (পরীক্ষা পাশের) কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এ দুঃখের শেষ নেই। নিজ মুখে বলে গিয়েছিলেন—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রেখে গেলাম এই শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর জীবনে অঙ্গীভূত করে। কেউ একবার ভেবে দেখলেন না, সে সম্পদটা কি? ভাবেননি বলেই সে জীবন বিধ্বস্ত এবং সে সম্পদ বিলুপ্ত। রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্য থাকবে, রবীন্দ্রসংগীত থাকবে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাও থাকবে ; থাকবে না শুধু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী। সে জায়গা থাকবে U.

G. C. -র বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথকে নামঞ্জুর করে দিয়ে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী থাকবে মঞ্জুরি কমিশনের আশ্রয়ে। এখানে একটি কথা সবিনয়ে বলছি। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার বিশ্বাভারতীকে Institution of National importance বলে ঘোষণা করেছিল। পরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে গিয়ে ওর আগের বৈশিষ্ট্য সবই লোপ পেতে বসেছে। এর চাইতে সে যদি সেই পূর্ব-স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই থাকে তাহলে সে অনেক সহজে আপন স্বভাব অনুযায়ী কাজ করতে পারে। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পা মিলাতে গিয়ে অনর্থক পদে পদে হোঁচট খেতে হয় না। স্বভাব বিরুদ্ধ কাজের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেতে পারে। এখন সে কথা ভেবে দেখা উচিত।

রবীন্দ্র জীবনের ট্র্যাজেডি হল অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ট্র্যাজেডি। এ যুগটার এমন বিস্ফারিত চক্ষু এবং অপলক দৃষ্টি যে, কিছুই তার অ-দেখা বা অ-জানা থাকে না। কিন্তু অতি মাত্রায় কৌতূহলী হওয়ার দরুণ তিলকে তাল করে। সেই সঙ্গে আবার সংশয়ী মন বলে প্রতি ঝোপেই ভূত দেখে। সে জন্যে অনেক দেখলেও অনেক জেনেও দৃষ্টিভ্রম তো বটেই মতিভ্রমও ঘটে ; নতুবা রবীন্দ্রনাথের নামে এত রকমের উদ্ভট গল্প শোনা যাবে কেন ? শুধু শোনা নয়, ওই সব কাহিনী নিয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করা হয়েছে। লেখক যদি দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন হন তাহলে আশা করা যায় লিখবার পূর্বে বিষয়বস্তুর বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি অবশ্যই ভেবে দেখবেন। বিশ্বাস-যোগ্যতার পরীক্ষা হল যাঁর সম্বন্ধে কাহিনী তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এর মিল আছে কিনা, অর্থাৎ তাঁর পক্ষে এরূপ কাজ করা সম্ভব কি না। রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা চিন্তাধারা এবং মনের প্রবণতাগুলির সঙ্গে পরিচয় নেই বলে কোন কোন লেখায় অত্যন্ত অপরিণত মনের প্রকাশ দেখেছি। একবার একজন সাংবাদিক একটি খ্যাতনামা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে সেই জমিদারি পরিচালনার যুগে কবে নাকি রবীন্দ্রনাথের বোট নদীতে ডুবে গিয়েছিল। জমিদার মানুষ, পণ্ডিত নন তো, কাজেই 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং' তো দূরের কথা অর্ধ পয়সাটি ত্যাগ না করে ক্যাশ বাক্সটি কোমরে বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং প্রবল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বহু কষ্টে তীরে পৌঁছেছিলেন। প্রাণের চাইতেও টাকার মায়া বেশি ইত্যর্থঃ। কিন্তু এরূপ চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনার কথা রবীন্দ্র-জীবনীতে বা অন্য কোথাও কারো লেখায় দেখিনি, কারো মুখেও শুনিনি। একবার গোরাই নদীর ব্রিজে বোটের মাস্তুল ঠেকে গিয়ে বোট উল্টে যাবার উপক্রম হয়েছিল। মাঝি মাল্লারা ব্যাপারটা কোন রকমে সামলে নিতে পেরেছিল ; কাজেই অঘটন কিছু ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন ছিন্নপত্রের পাতায়। পূর্বোক্ত ঘটনার অনুরূপ কিছু ঘটে থাকলে তারও উল্লেখ কোথাও অবশ্যই থাকত। আমার এক বন্ধু উক্ত পত্রিকায় চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন ওই কাহিনী লেখক কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রবন্ধলেখক নিজেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি একেবারে unimpeachable source থেকে খবরটি পেয়েছেন। মজার কথা এই যে, ওই unimpeachable sourceটি নিজে কিন্তু এ ঘটনাটির কথা কোথাও লেখেননি। এই হচ্ছে এঁদের কর্ম-পদ্ধতি। অতিশয় চতুর, শাস্ত্র বাক্য মেনে চলেন—শতং বদ, মা লিখ। মুখে ব'লো লিখতে যেয়ো না। অর্থাৎ

আলগোছে কোন অপোগণ্ডের কানে কথাটা তুলে দিয়ো, লিখতে হলে সে-ই লিখবেন। এরূপ রবীন্দ্র-নিন্দুক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যথেষ্ট ছিল, এখনও বেশ কিছু আছে। চমকপ্রদ একটা খবর সংগ্রহ্ করতে পারলেই্ ফলাও করে লিখে দেবেন। ভাবেন, মস্ত বড় একটা আবিষ্কার হ্ল। ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একটুও ভেবে দেখেন না। ভাবলে দেখতে পেতেন, এ সব কল্পিত ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্র-চরিত্রের কোনও সামঞ্জস্য নেই।

ইদানীং কালে লেখায় চমক লাগাবার খুব একটা চেষ্টা দেখা যায়। চমক লাগানোটা যে দুর্বলতার লক্ষণ সে কথা কেউ মনে রাখেন না। Stunt জিনিসটার স্থায়িত্ব নেই, সেজন্যে stunt দিয়ে কেউ লেখক হিসাবে কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন না। এমন যে এইচ জি ওয়েল্স— তাঁকেও অরবিন্দ বলেছিলেন সুপার-জার্নালিস্ট। আমাদের অধিকাংশ লেখকই মিনি-জার্নালিস্ট, কারণ লেখার মধ্যে সাহিত্যবোধের পরিচয়টা সুস্পষ্ট নয়।

কোন কোন লেখককে দেখেছি প্রচুর পরিশ্রম করে মেলাই মাল মশলা জড় করেছেন, কিন্তু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সবের যোগসূত্রটা কোথায়, তা ঠিক ভাবে ধরতে পারেননি বলে সিদ্ধান্তগুলি সব সময়ে অভ্রান্ত নয়। টমসনের বেলায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন এঁদের বেলায়ও তা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূল কথা

সর্বদেশে সর্বকালে কবিরাই দেশের এবং জাতির সর্বোত্তম শিক্ষক। রামায়ণ মহাভারতের কবি আমাদের আদিগুরু, ইলিয়াড অডিসির রচয়িতা ইউরোপের। মহাকাব্য মাত্রই বিশেষ কোনো সভ্যতার এবং বিশেষ কোনো যুগের সর্বাঙ্গীণ আলেখ্য। সামগ্রিক জীবনের চিত্র হিসাবে প্রত্যেকটি মহাকাব্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ; কারণ জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের নামই শিক্ষা। সংসারধর্ম পালন করতে গেলে সাধারণভাবে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হত সেকালের লোকেরা তার সমস্তই এই-জাতীয় মহাকাব্য থেকে আহরণ করেছে। সাধারণ লোকাচার থেকে শুরু করে সামাজিক রীতিনীতি রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতি, মানুষের সুখদুঃখ স্নেহপ্রেম ভয়ভাবনা—মানুষের সকল রকম বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি নিয়ে মহাকাব্যের বিস্তৃত আসর। এই-জাতীয় মহাকাব্যকে একটি মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বললে কিছুই অন্যায় হয় না। সত্যি বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও ব্যাপকতর এর শিক্ষা, কারণ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই সমগ্র জীবনের সঙ্গে বিদ্যার্থীর পরিচয় সাধন করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে জীবিকার জন্য যদি বা প্রস্তুত করে, জীবনের জন্য করে না।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করেননি। সর্বকালের মহাকবিদের ন্যায় তাঁরও প্রতিভা দশভূজা। মানবজীবনের এমন সর্বাঙ্গীণ চিত্র এ যুগের আর কোনো কাব্যে বিরল। এবং সেই সকল কারণেই তিনি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আগেই বলেছি কবিমাত্রেই কাব্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানের কার্য করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর একমাত্র কবি, যিনি শুধু কাব্যের মারফতে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্যের ভার নিয়েছিলেন।

কোনো কবি যখন নিজহাতে শিক্ষাদানের কার্য গ্রহণ করেন তখন তার মধ্যে খানিক পরিমাণে কাব্যগুণ প্রবেশ করতে বাধ্য। কাব্যের প্রধানতম গুণ আনন্দদান। আমি গোড়াতেই কবিকে জনগণের শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু শুধু শিক্ষক বললে সবটুকু বলা হয় না। তাঁরা লোকরঞ্জন শিক্ষক, মনোরঞ্জন তাঁদের স্বভাবধর্ম। কবি জানেন, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর তারই জন্ম আনন্দ থেকে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন নিজস্ব শিক্ষাধারার প্রবর্তন করলেন তখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর আনন্দবিধান। বিদ্যারম্ভে বালকবয়সের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ছিল। ইস্কুলে যাওয়ার নাম দিয়েছিলেন দীপান্তর বাস, নিজেকে বলেছেন

ইস্কুল-পালানো ছেলে। সেই ইস্কুল-পালানো ছেলে বড় হয়ে নিজেই এক ইস্কুল করলেন। উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট ; নিশ্চয় ভেবেছিলেন এমন ইস্কুল করে দেব, যেখানে ছেলেরা ঘর থেকে পালিয়ে ইস্কুলে আসবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সবচাইতে বড় পরিচয়—এটি ইস্কুল-পালানো ছেলের নিজের হাতে গড়া ইস্কুল।

ইস্কুল পালানো ছেলে যখন ইস্কুল স্থাপন করেন তখন শুধু তার প্রকৃতি নয় আকৃতিও বদলে যায়। তাই হল। ইস্কুল বসল খোলা মাঠে, গাছের তলায়। গাছের তলায় ক্লাস, কাজেই ক্লাসের চেহারা বদলাল, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব। যেখানে গাছের ডালে পাখি গান করছে, ঝোপে ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, সেখানে গুরুমশায়ের কর্কশ কণ্ঠও আপনিই একটু মোলায়েম হয়ে আসে। গতানুগতিক পাঠাভ্যাসের মধ্যে একটু একটু রঙের ছোপ না লেগে যায় না।

বিদ্যালয়ের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি অনুকূল পরিবেশ। গাছ যেমন মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া আর রৌদ্র থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, শিশু তেমনি আপনিই অজ্ঞাতসারে চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ থেকে জীবনরস সংগ্রহ করে। বিদ্যালয়ের গৃহ, পাঠ্যপুস্তক, নিত্যকার পাঠাভ্যাস নিয়মকানুন বিধিনিষেধ—এসবের চাইতে ওই পরিবেশ অনেক বেশি মূল্যবান এ কথা রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বলে নিয়েছিলেন।

ছাত্র শিক্ষক দুইয়ে মিলে প্রতিদিন যে জীবনযাপন করবেন তাই থেকেই সে পরিবেশের সৃষ্টি হবে। তাই হয়েছে। ছেলেরা যেখানটায় সারাদিন আনাগোনা করেছে তারই একপাশে দেখেছে ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানসাধনায় মগ্ন। কবি স্বয়ং সাহিত্যসাধনায় লিপ্ত। তথাপি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অঙ্গসজ্জা এবং ছাত্রদের আনন্দবিধানে তাঁর নিরলস অধ্যবসায়। অধ্যাপকরাও সকলেই দৈনন্দিন অধ্যাপনা ছাড়া আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী কোনো বিশেষ বিদ্যা কিংবা শিল্প-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। দিনের অধিকাংশ সময় কোথাও-না-কোথাও সংগীতচর্চা চলছে, তার সুর ভেসে আসছে। কোথাও নাটকের মহড়া হচ্ছে, অভিনয়কুশলী ছাত্রদের সেখানে ডাক পড়েছে। ছাত্রদের নতুন আবাসগৃহ তৈরি হয়েছে, শিল্প-অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে তার দেয়ালগাত্রে ছবি আঁকা হচ্ছে। চোখে দেখে ভালো লাগে, কানে শুনে ভালো লাগে এমন অনেক জিনিস চতুর্দিকে থাকলে তবে সৌন্দর্যবোধ জন্মাবে, রুচি পরিমার্জিত হবে!

আমাদের দেশে বলা হয়, অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। কবি তাঁর বালখিল্যদের তপঃক্লিষ্ট মূর্তি দেখতে চাননি। তিনি তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখই দেখতে চেয়েছেন। নীরস পাঠাভ্যাসকে সরস করবার জন্যে বহুবিধ আনন্দের আয়োজন করেছিলেন। নিত্যকার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা গান শিখেছে, ছবি এঁকেছে, নাটক করেছে। ক্লাসের খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি তাদের খোলা মাঠে ছুটির নিমন্ত্রণে আহ্বান করেছেন। পাঠ্য বইয়েরও নাম দিয়েছেন 'ছুটির পড়া'। পড়া আর কাজ আর খেলা, এই তিনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। নিত্যদিনের বিদ্যাভ্যাস বৈচিত্র্যের অভাবে নীরস হতে বাধ্য, এ কথা তাঁর জানা ছিল। পড়াকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবন করে খেলার মাধ্যমে নতুন কথা শিখিয়েছেন।

কাব্যসাহিত্য রচনায় যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন বিদ্যালয়-পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ সেই কল্পনাশক্তির ব্যবহার করেছেন। কাব্যরচনা যেমন সৃষ্টিমূলক কাজ, তাঁর

শিক্ষারীতির প্রবর্তনে সেই সৃজনীপ্রতিভাই কাজ করেছে। বিদ্যালয়ের কাজ তাঁর সাহিত্যকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটি আর একটির সহায়তা করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেনকে গড়ে তুলেছেন, শান্তিনিকেতন তেমনি অংশত রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। ছাত্রদের সকল রকম ক্ষ্যাপামির প্রশ্রয় তাঁর কাছে। তিনিই নাটের গুরু, ছেলে-ক্ষ্যাপানো সর্দার, দলের ঠাকুরদা ; ছেলেমেয়েদের জন্য গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন, নাটক রচনা করেছেন। এই ছেলের দল চতুর্দিকে না থাকলে 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী' কখনো লেখা হত না, অসংখ্য গানে প্রাণের আনন্দ এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হত না, এরা তাঁর সাহিত্যে অনেকখানি বৈচিত্র্য এনেছে। এই দিক থেকে ছাত্র শিক্ষক সকলেই এক বিরাট সৃষ্টিমূলক কাজের অংশীদার। শিক্ষাকে তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে পরিণত করেছিলেন বলেই সেই কাজে এতখানি আনন্দের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতূহলকে উদ্দীপিত করেছেন। পশুপাখি পোকামাকড় গাছপালা ফুলফল সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন। ঋতুবৈচিত্র্য কখনো তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছন---তুমি কে গো, আমি বকুল ; তুমি কে গো, আমি পারুল ; তোমরা কে বা—আমরা আমের মুকুল গো। শরৎ-আকাশে সোনার আলো যেদিন প্রথম ফুটেছে সেদিন প্রত্যুষে ছেলেমেয়েরা বৈতালিক করেছে—আমার নয়ন-ভুলানো এলে ; বসন্ত সমাগমে ধরণী যেদিন রোমাঞ্চিতকলেবর সেদিন ছাত্ররা সমস্বরে গেয়েছে---আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বর্ষার দিনে তো কথাই ছিল না, মিলিত কণ্ঠের গান বর্ষার ঝমঝমানিকে হার মানাত।

কেবল প্রকৃতিপাঠের শিক্ষাই দেননি, চতুপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার সঙ্গেও ছাত্রদের পরিচিত করেছেন। বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। গোড়াতেই বলে নিয়েছিলেন, 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।' আগেই বলেছি, বসেছেন গাছের তলায়, পথের ধারে। বিদ্যাকে পুঁথির গণ্ডি থেকে বের করে পথের ধারে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ যে বিদ্যাচর্চা এতদিন ছিল পুঁথির পাঁচালি, এখন তার নাম হল পথের পাঁচালি। যেখানে পায়ে চলার পথ সেখানেই জীবনের স্রোত। নিত্যবহমান স্রোত থেকে যে বিদ্যা আহরণ করা হয় সে বিদ্যাই জীবন্ত বিদ্যা। হাটের দিন গাঁয়ের লোক গোরুর গাড়ি কিংবা ঝাঁকা মাথায় শহরের হাটে জিনিস বিক্রি করতে চলেছে। ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে তার ফর্দ করেছে। এ অঞ্চলে কোন্ ঋতুতে কি জিনিস জন্মায় তার স্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া কিংবা ক্যানাডায় কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার চাইতে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভূগোলপাঠকে অনেক বেশি জীবন্ত করে তুলেছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইতিাসের ছাত্র যখন রাজারাজড়ার কাহিনী কণ্ঠস্থ করেছে তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে। ছেলেরা স্বচক্ষে দেখেছে গ্রামবাসীদের অতিজীর্ণ বাসগৃহ, তাদের নিরতিশয় দরিদ্র জীবনযাত্রা। দেশের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ছেলেটাকে আমরা ভূগোলের পাঠ মুখস্থ করাই কিন্তু তার

নিজের জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিত করি, তার নিজের চতুষ্পার্শ্বকেই সে চেনে না। তাকে ব্যাকরণ শেখাই, কিন্তু তার মুখের ভাষা কেড়ে নিই। মাস্টার বক্তা ছাত্রটি নীরব শ্রোতা, গুছিয়ে কথা বলতে শেখে না। এই জন্যে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যসভার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ খুশিমত নিজের মনের কথা সাজিয়ে গুজিয়ে সকলের সামনে হাজির করে। সেদিন ছাত্ররা বক্তা, মাস্টারমশাইরা শ্রোতা। নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দ যে শিশুমনকে কতখানি আন্দোলিত করে, শান্তিনিকেতনের এই সব সাহিত্যসভা দেখলে তবে বিশ্বাস হবে। ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী এই আনন্দময় আত্মপ্রকাশের আর-একটি নিদর্শন।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যক্রম এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু তারই মধ্যে পরীক্ষা পাশের যৎসামান্য প্রয়োজন ছাপিয়ে অনেকখানি উদ্বৃত্তের অবকাশ রচনা করা হয়েছিল। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় এখানেই মূল পার্থক্য। পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষা উদ্বৃত্তের কোনো স্থান নেই। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে একটি চাক্‌রে মনুষ্য তৈরি করে দেওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যে মানুষটা তৈরি হয়, সে ভাবে-ভাবনায় যেমন আটপৌরে, কাজে তেমনি নড়বড়ে। জীবিকার সংস্থান যদি বা হয়, জীবনের শূন্য কিছুতেই ভরাট হয় না। তার শিক্ষার মধ্যে এতটুকু উদ্বৃত্ত নেই যা দ্বারা মনের সেই শূন্যতা বা দারিদ্র্যকে সে ঢেকে রাখতে পারে। মানুষকে জীবিকার জন্যে তৈরি করা আর জীবনের জন্যে গড়ে তোলায় অনেক তফাত। অবশ্য জীবিকার কথাও ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই সে কথা বলেছেন। আমাদের শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ তার কারণ আমরা একটা গোটা মানুষের সামান্যতম অংশ অর্থাৎ কেবল তার স্মৃতিশক্তি, খানিটা বা বুদ্ধিবৃত্তির খবরদারি করি। যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তার মনের পরিচর্যা করি না। তাছাড়া দেহটা থেকে যায় অপটু, কোনোরকম হাতের কাজে দক্ষতা জন্মায় না। রবীন্দ্রনাথ এদের বলেছেন বোকা হাতের মানুষ। খাদ্য বস্ত্র নিত্যব্যবহারের প্রত্যেকটি বস্তু সে সমাজের কাছ থেকে হাত পেতে গ্রহণ করে ; ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও নিজ-হাতে প্রস্তুত করে সমাজের হাতে তুলে দেয় না। যে ব্যক্তি কেলবমাত্র ভক্ষক, যে কোনো জিনিসের উৎপাদক নয়, সামাজিক প্রাণী হিসাবে তাকে শিক্ষিত বলা চলে না। আমাদের আধুনিক কবি বলেছেন—আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের—রবীন্দ্রনাথ ওকথা কবিতায় বলেননি, কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে মুচি বা ছুতোরের কাজে খানিকটা দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি কাঠের কাজ চামড়ার কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেরা সবজির বাগান করেছে ; শুধু নিজেদের রান্নাঘরে নয় পাড়াপ্রতিবেশীর রান্নাঘরেও তাই থেকে জোগান দেওয়া হত, কারণ ধারে কাছে হাটবাজার ছিল না।

আগেই বলেছি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার অপর নাম পরীক্ষা-পাস। বাঁধা গতে মুখস্থ করা আর কিছু মামুলি তথ্য সংগহ করার নাম হয়েছে শিক্ষা। সেই তথ্যের বেশির ভাগই জীবনের কোনো কাজে লাগে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা মনকে জাগিয়ে দেবে, কৌতূহলকে উদ্দীপিত করবে। আপন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে, পারিপার্শ্বিককে ছাপিয়ে সহানুভূতির সম্পর্ক বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হবে। মনের স্থূলতা দূর করে রুচিকে মার্জিত করবে, শিক্ষিত মনের

স্পর্শে চতুর্দিক প্রসন্ন হবে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—বিদ্যা বৃংহণানাম—বৃংহণের মধ্যে অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। পরীক্ষা-পাসের বিদ্যায় সেই পুষ্টি কোথায়? আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন ভিটামিন পদার্থ নেই যা মনকে পুষ্ট এবং প্রাণবন্ত করতে পারে। জীবিকার্জনের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। খুব ভালো কথা। বৃত্তিতে আমার আপত্তি নেই যদি তাতে উদ্বৃত্তের একটু অবকাশ থাকে। কেবলমাত্র খাওয়াপরার চিন্তা নিয়ে যে জীবন তাতে জীবধর্ম যদিবা বজায় থাকে মনুষ্যধর্ম বজায় থাকে না। জীবিকার সঙ্গে জীবনকে মেলাতে পারলে তবেই শিক্ষা সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই মিলন-সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাচর্চার আর এক নাম জীবনচর্চা। তাঁর বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি জীবন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যালয়ের কাজ আর জীবন গড়ার কাজ একই সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই কাজে ছাত্র শিক্ষক সকলে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গোড়ার দিকের সেই ইতিহাসটুকু বলে নিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে ইস্কুল। এক দিকে খোয়াই, ক্ষয়ে-যাওয়া মাটি, তাতে তৃণটুকু জন্মায় না। মাটির প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। আর-এক দিকে মানুষের ক্ষয়ে-যাওয়া মন, মনের জীবনীশক্তি লুপ্ত। মাটির পরিচর্যা আর মানুষের মনের পরিচর্যা দুইই একসঙ্গে শুরু করলেন। জানতেন, মাটির বন্ধ্যাত্ব ঘুচলে তবে মনের বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে। খোয়াই-এর বিস্তার বন্ধ হল। মাটির গায়ে যেমন সবুজের ছোঁয়াচ লাগল তেমনি ছাত্র মাস্টার সকলের মনে। একটি স্থান এবং তার আনুষঙ্গিক জীবনকে গড়ে তোলার কাজে তিনি ছাত্র শিক্ষক সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কিছুকে গড়ে তোলার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই শিক্ষার মধ্যে সেই রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছেন। সেদিনকার শান্তিনিকেতনে প্রকৃতিদেবীর দাক্ষিণ্য বড় সুপ্রচুর ছিল না। আহার্যদ্রব্য, পানীয় জল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মত জোড়াতালি দিয়ে অনেক ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপন বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বাধা উত্তরণের রোমাঞ্চ ছেলেমেয়েরা প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে। এখানকার দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ভার অনেকখানি ছাত্রদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। নিজেদের আবাসগৃহ, বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ এবং চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থার ভার তাদের উপরেই থাকত। রান্নাঘরের তদারক তারাই করেছে, অতিথি পরিচর্যা তাদের অন্যতম দৈনিক কর্তব্য ছিল। নিজেদের খেলাধূলার ব্যবস্থা তো করেছেই; এমন কি ছাত্রদের মধ্যে কেউ অন্যায় আচরণ করলে নিজেদের পরিচালিত বিচারসভায় তার বিচার হয়েছে। শাস্তি দিতে হলে তারাই দিয়েছে। এ ছাড়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সেবাবিভাগের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত সেবাকার্য করেছে। এই যে ব্যবস্থা, শিক্ষার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। যে প্রতিষ্ঠান এবং যে জীবনকে তারা গড়ে তুলেছে তার প্রতি তাদের মমতা বেড়েছে। এই মমতাবোধ ক্রমে প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—এক কথায় জীবনকে ভালোবাসতে শিখেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে সার মাইকেল স্যাডলার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে শান্তিনিকেতন-জীবনের এই শিক্ষণীয় দিকটার প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আজকের দিনে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সকলেই লক্ষ

করে থাকবেন, আজকের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও একটা নির্মমতা আছে। কোনো কিছু নিজহাতে গড়ে তোলেনি বলে অপরের গড়া জিনিস তারা অনায়াসে ভেঙে দিতে চায়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র শক্ত হলে ইস্কুল-কলেজে দক্ষযজ্ঞের পালা হয়, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে ট্রাম-বাস পুড়িয়ে দেয়। দেশের এবং দশের সম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই। এই চিত্তবিকারের জন্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং খানিকটা আমাদের সমাজব্যবস্থা দায়ী। আমাদের শিক্ষাবিদরা বলেন, ছাত্রদের ভালোবাসতে হবে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শেখালেন যে শুধু ভালোবাসলেই হবে না, তাকে শ্রদ্ধাও করতে হবে। ছেলেদের আমরা নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই মনে করি। কোনো কাজে তাদের ডাকি না, তাদের সহযোগিতা দাবি করি না। জন্মে অবধি এরা অতিথি, এরা আগন্তুক। এরা কোনো কিছুর শরিক নয়। কোনো ব্যাপারে মালিকানা তো দূরের কথা শরিকানা স্বত্বও অনুভব করে না। ফলে জীবনকে এরা ভালোবাসতে শেখে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ থেকে আমাদের যা শিক্ষণীয় এইটি তার মধ্যে সর্বপ্রধান। এখানে বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রশিক্ষাবিধি দুইয়ের মূলকথা এক। রবীন্দ্রসাহিত্য আমি কিছুমাত্র যদি বুঝে থাকি, তবে বলব তার প্রধানতম কথা হচ্ছে—আমি যে পৃথিবীতে এসেছি সেই পৃথিবীকে ভালোবাসব, আমি যে জীবন লাভ করেছি, দেহে মনে প্রাণে সেই জীবনের আমি শরিক হব। ইংরেজিতে যাকে বলতে পারি—fullest possible participation in life —তাঁর শিক্ষার মূলেও সেই কথা। ছেলেটির চতুষ্পার্শ্বে যে জীবনধারা চলছে তার অংশীদার তাকে হতে হবে। তাতে এক দিকে যেমন সে জীবনকে ভালোবাসতে শিখবে তেমনি জীবনের দায়িত্বকেও সে স্বীকার করে নেবে।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যৌবনে কবি যখন বিলেতে যান, তখন রেলপথে ফ্রান্স অতিক্রম করেছিলেন। মানুষের যত্নে এবং শ্রমে দেশ যে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তাই দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। রেলের দুধারে পপ্‌লার গাছের সারি, কোথাও ফলের বাগান, কোথাও আঙুরের ক্ষেত। ছবির মত মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছেন, দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি এরা কঠিন পরিশ্রমে সুন্দর করে তুলেছে। ফলে এদের দেশভক্তি সত্য হয়ে উঠেছে। আর আমরা নিজহাতে দেশকে গড়ে তুলছি না বলে দেশের প্রতি সত্যকার মমত্ববোধ জন্মাচ্ছেই না। স্বাধীনতা লাভের পর দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে দেশব্যাপী বিরাট আয়োজন চলছে, কিন্তু এর উদ্যোগ পর্বটা হওয়া উচিত ছিল ইস্কুলে-কলেজে; তা হয়নি বলে ফল কিছুই হচ্ছে না। ছেলেবেলা থেকে যে আপন চতুষ্পার্শ্বকে সুন্দর করে গড়তে শেখেনি সে আজকে হঠাৎ দেশকে গড়ে তুলবে, এ কথা মনে করাই হাস্যকর।

দেশকে জাতিকে গড়ে তোলাই সকল শিক্ষার মূলগত উদ্দেশ্য। মনকে গড়ে তোলবার জন্যে খানিকটা পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হবেই। মনীষী ব্যক্তিদের মনীষা এবং মহৎ চিন্তার সঙ্গে পরিচয় মানসিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথির জগতে আবদ্ধ থাকলে মনের শৌখিন বৃত্তি ঘোচে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তবে মনে সঞ্জীবতা আসবে, বলিষ্ঠতা আসবে। যেখানে চাষী চাষ করছে, তাঁতি তাঁত বুনছে, কলু ঘানি ঘোরাচ্ছে, কুমোর হাঁড়িকলসি গড়ছে, কামার কোদালকুড়ুল তৈরি করছে --সেই জীবনের সঙ্গে

পরিচয় চাই, তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য দেশকে গড়ে তোলা, তা কিছুতেই সফল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারীতি আলোচনা করবার সময় একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীর খুব কম শিক্ষাবিদ্ই হাতেকলমে শিক্ষাদানের কাজ করেছেন। বেশির ভাগ শিক্ষাবিদ্ই দূর থেকে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান জিনিস, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার ইমারত গড়তে বসেছিলেন তার ভিত থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপ নিজহাতে গড়ে তুলেছেন, প্রয়োজনবোধে গড়া জিনিস ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন, অদলবদল করেছেন। শিক্ষাপ্রণালীর অপূর্ণতা যেমন চোখে পড়েছে, তেমনি ভাবে তার পরিবর্তন সাধন করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যে মানুষকে জানবার জন্যে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য দর্শন অধ্যয়নের আয়োজন, সেই মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে, তার অভাব অভিযোগের কথা ভাবতে হবে। তাব বাসের অযোগ্য গৃহকে বাসযোগ্য, তার ভাগ্যহীন জীবনকে উপভোগ্য করবার ভার শিক্ষিতেরা যদি গ্রহণ না করেন তবে দেশের শ্রীহীন মলিনমূর্তি কখনো ঘুচবে না। এইজন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যার্থীদের চোখের সমুখে তিনি শ্রীনিকেতনের অনুশীলনকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। এই দিক থেকে শ্রীনিকেতনকে বলা চলে শান্তিনিকেতনের ল্যাবরেটরি-গৃহ। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন—একটি আর একটির পরিপূরক। এই দুটিকে মিলিয়ে দেখলে তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক রূপটি পাওয়া যায়।

শিক্ষার চরম-লক্ষ্য সহানুভূতির বিস্তৃতি। অশিক্ষিত মন একান্তভাবে আপন স্বার্থের সীমানায় আবদ্ধ। তার আনুগত্য কেবলমাত্র নিজের এবং আপন জনের প্রতি। অপর পক্ষে শিক্ষিত মনের সহানুভূতি আপন পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে আপন সমাজ, সমাজকে ছাড়িয়ে দেশ এবং দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশ, এক কথায় সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত। পরবর্তীকালে কবি যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন বিশ্বমৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠাকেই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটুকু জানা থাকলে কথাটা স্পষ্ট হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কবি পশ্চিম মহাদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দেশে দেশে শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণ তাঁকে শান্তির দূত হিসাবে রাজকীয় সংবর্ধনা জানিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মতিগতি দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এঁরা শুধু মুখেই শান্তির বাণী উচ্চারণ করছেন কিন্তু গোপনে প্রত্যেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। উগ্র জাতীয়তার বিষ বিশ্বের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। আর একটি মহাযুদ্ধ অনিবার্য, এটি তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শান্তিনিকেতনের একজন অধ্যাপককে তাঁর হৃদয়বেদনা জানিয়ে লিখেছিলেন—

পশ্চিম ভূভাগ কামানবন্দুকের আয়োজন করুক—যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্য

আমাদের সাধনা।...ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণরূপে মুছে যাক্—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটিমাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেছি! তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর—হৃদয়কে উন্মুক্ত কর্—শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।

বলা বাহুল্য দেশে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বভারতী স্থাপনের এই হচ্ছে ইতিহাস। স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলেন যে, শিক্ষারীতির আমূল পরিবর্তন চাই। মানুষের মনকে নতুন করে গড়তে হবে, তবেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হবে। বিশ্বভারতী যে কেবলমাত্র বি. এ. এম. এ. পাস আর ডিগ্রি বিতরণের জন্যে স্থাপিত হয়নি সে কথাটি সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

দৈনন্দিন শিক্ষণ ব্যাপারের নানা সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলে বহু কথা বলেছেন সেসব কথা বিশেষ মূল্যবান হলেও আমি এ প্রবন্ধে তার আলোচনা করিনি। আমি শুধু তাঁর শিক্ষানীতির কয়েকটি মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। সর্বশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। বিদ্যা এবং শিক্ষা—এই দুটি কথাকে আমরা সমার্থবোধক বলে মনে করি এবং ব্যবহার করি। লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন কিন্তু বিদ্যাদানের কথা যৎসামান্যই বলেছেন। সারাজীবন শিক্ষার কথাই বলেছেন। তার কারণ বিদ্যার চাইতে শিক্ষা ঢের বড় জিনিস। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই যেমন ধার্মিক হওয়া যায় না, বিদ্যালাভ করলেই তেমনি শিক্ষিত হওয়া যায় না। অধীত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের যোগ নেই বলে দেখা যায় তেমন-তেমন বিদ্বান ব্যক্তিও মূলত অশিক্ষিত। মুখস্থ বিদ্যা যখন ধাতস্থ হবে তখনই তার নাম শিক্ষা। পরীক্ষা পাসের তাগিদে যা-কিছু শিখেছিলুম তা বাদ দিয়ে বাড়তি কিছু যদি আমার মনে মজ্জায় লেগে থাকে সেটুকুই আমার শিক্ষা, বাকিটুকু বিদ্যার ছোবড়া। ধর্ম যেমন আচরণের বস্তু, শিক্ষাও তেমনি আচরণের বিষয়। যিনি সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তি তিনি 'মনসা কর্মণা বাচা' শিক্ষিত অর্থাৎ তিনি যে যথার্থই শিক্ষিত তা প্রকাশ পাবে তাঁর মনের চিন্তায়, মুখের বাক্যে, তাঁর প্রতিদিনের কর্মে। আমি মানুষটা ধার্মিক কি না সেটা আচরণের দ্বারা প্রকাশ করা যদি কঠিন হয়ে পড়ে তবে বাধ্য হয়ে আমাকে বাহ্যিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় অর্থাৎ ফোঁটাতিলকের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—ডিগ্রি ডিপ্লোমা পাসের মার্কা তথাকথিত শিক্ষিতের ফোঁটাতিলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এই ফোঁটাতিলকটা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। পুঁথি-পড়া পণ্ডিত চাননি, নির্ভেজাল শিক্ষিত মানুষ চেয়েছিলেন। সকলেই পণ্ডিত হয় না কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার গুণে সহজ সরল সুস্থচিত্ত মানুষ হতে পারে। আমাদের দেশ নিষ্প্রাণ, সেখানে তিনি প্রাণবন্ত মানুষ চেয়েছেন। তারা নিঃশ্বাসবায়ুর মত অনায়াসে আনন্দ উপভোগ করবে, সর্বত্র আনন্দ পরিবেশন করবে। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'—প্রকৃত শিক্ষিতমনের এই হচ্ছে প্রসাদগুণ,

তার স্পর্শে চতুর্দিক প্রসন্ন হবে। বলা বাহুল্য এ শিক্ষা তিনি শুধু শান্তিনিকেতনের জন্য চাননি, সমস্ত দেশের জন্য চেয়েছেন। প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার—সেখানে এই সব প্রাণবন্তরা একটু সুর একটু রঙ এবং ব্যবহারের সৌকর্যে অনেকখানি মাধুর্য বিকীর্ণ করবে, যৌবনের দূত হিসাবে সর্বত্র নতুন জীবনের বার্তা বহন করে আনবে

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা

বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি এমন কথা আমরা শিক্ষিত মানুষেরা হামেশাই বলে থাকি। বলা বাহুল্য, আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে এটিও একটি। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ যুগে বিজ্ঞানের চর্চা অনেক বেশি বেড়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে একথাও নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হবে না যে, বিজ্ঞান মানুষের আদিতম সৃষ্টি। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়—প্রাণরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৃত্তি। আদি মানবকে জন্ম মুহূর্ত থেকেই প্রাণরক্ষার উপায় খুঁজতে হয়েছে। শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি—প্রকৃতির নানাবিধ নির্মমতা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস তাকে প্রথমাবধিই করতে হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে তার বোঝাপড়া চলেছে প্রথম দিন থেকে। একদিকে যেমন তাকে দেখেছে প্রধান বৈরী হিসাবে, অপরদিকে ক্রমে তার দাক্ষিণ্যের মূর্তিটিও তার চোখে পরিস্ফুট হয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির হাতেই তার নিঃশ্বাস বায়ু, তার উদরান্ন। প্রাণের দায়ে এক হাতে তাকে ঠেকিয়েছে, আরেক হাতে তোয়াজ করেছে।

বোধ এবং বুদ্ধি এই দুই নিয়ে মানুষের ইতিহাস। মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপ স্বতঃস্ফূর্ত তা প্রধানত বোধের অন্তর্গত। বোধের স্বতঃফূর্তি থেকেই শিল্পকলার জন্ম হয়েছে। মনের খুশিতে সে গান গেয়ে উঠেছে, আনন্দে নৃত্য করেছে, পর্বত গুহায় ছবি এঁকেছে। আদিম মানুষের মনে যতখানি শিল্পবোধ জাগ্রত ছিল, বিজ্ঞানবুদ্ধি তার চাইতে বেশি ছাড়া কম ছিল না। বুদ্ধি দিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে যে জিনিসকে আমরা গ্রহণ করি, তারই নাম বিজ্ঞান। স্বল্পমাত্রায় হলেও আদি মানুষের সেই বুদ্ধি ছিল। আগেই বলেছি, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হয়েছে প্রাণের দায়ে, যার চাইতে বড় দায় আর নেই।

প্রকৃতির মধ্যে একটি পর্যায়ক্রম আছে। খুব বাঁধা নিয়মে সেই পর্যায় চলতে থাকে, তার ব্যতিক্রম বড় একটা হয় না। মানুষ গোড়া থেকেই এই ব্যতিক্রমহীন পর্যায়টিকে লক্ষ করে এসেছে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কোন ঋতুতে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, কোথায় কি খাদ্য কিভাবে সংগ্রহ হবে, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই থেকেই বিজ্ঞানের শুরু। বর্ণ পরিচয়ের বহু বহু যুগ আগে প্রকৃতি-পরিচয়ে মানুষের হাতেখড়ি হয়েছে। এসব কথা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। একাধিক বিজ্ঞানীকে সাক্ষী মানতে পারি। একজন বলেছেন, 'A moment's reflection is sufficient to show that no art or craft, however primitive, could have been invented or maintained, no

original form of hunting, fishing, tilling or search for food could be carried out without the careful observation of natural process and a firm belief in its regularity, without the power of reasoning and without confidence in the power of reason; that is without the rudiments of science.'

আগে বিজ্ঞান, পরে শিল্প। শিল্প শখের বস্তু। আত্মরক্ষার ব্যাপারে মানুষ খানিকটা যখন নিশ্চিন্ত বোধ করেছে, তখনই শখের কথা ভাবতে পেরেছে, তার আগে নয়। নিশ্চিন্ত মনের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতি বন্দনায়, অন্নদাত্রী মাতা বসুন্ধরার গুণকীর্তনে, যে সূর্যকিরণ সকল প্রাণের উৎস সেই সূর্যের স্তবে। প্রকৃতিবন্দনা দিয়েই কাব্য এবং শিল্পের শুরু। বলা বাহুল্য, প্রকৃতি বন্দনার মূলে আছে প্রকৃতি বিজ্ঞান। সেই আদি যুগ থেকেই কাব্য এবং বিজ্ঞানে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে। এই দুই-এর মধ্যে বিরোধ কোন কালে ছিল না, আজও নেই।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কবির কাব্যে বিজ্ঞান-নিষ্ঠার পরিচয় পেলে আমরা বিস্মিত হই। আমাদের ধারণা কবি এবং বৈজ্ঞানিক দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তের অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে এঁরা অতি-নিকট প্রতিবেশী। সত্যিকারের কবি এবং সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকের মতই সত্যনিষ্ঠ। আজগুবি কথা দিয়ে এক ধরনের রসসৃষ্টি যদিবা হয়, উঁচু দরের কাব্যসৃষ্টি হয় না। ইংরেজ সমালোচক কবিকল্পনাকে ফ্যান্সি এবং ইমাজিনেশন—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, সত্যিকারের কাব্য ইমাজিনেশনের সৃষ্টি। সে কল্পনা সম্ভাব্যতার সীমাকে কখনো লঙ্ঘন করে না। অর্থাৎ সে জ্ঞাতসারে সত্যভ্রষ্ট হয় না। ফ্যান্সি বা বল্গাহীন কল্পনা দূরগামী যদিবা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপথগামী হবার আশঙ্কা থাকে। ইংরেজ কবি পোপ মূর্খ কবিকুলকে ব্যঙ্গ করে যে Dunciad কাব্য রচনা করেছিলেন, তাতে অন্যান্য অনেক অভিযোগের মধ্যে বিশেষ করে এই অভিযোগ করেছিলেন যে, এঁদের মন বিজ্ঞানবিমুখ। বলেছিলেন রজার বেকন থেকে শুরু করে নিউটন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ইংলণ্ডে যে জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালিয়েছিলেন, এঁরা সেটি নিবিয়ে দিয়ে এক তমসা-রাজ্যের সৃষ্টি করেছেন এবং তারই ফলে কাব্যে এক তামসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। খুব ন্যায্য কথাই বলেছেন। যুক্তির শৃঙ্খলা অমান্য করলে কাব্য কাবিয়ানায় পর্যবসিত হয়।

একথা নিশ্চিত যে, অবৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কোন কবি মহাকবির আসন লাভ করেননি। অযৌক্তিক কথা কবির মুখে শোভা পায় না, মহাকবির মুখে তো নয়ই। শেক্সপীয়ারের নাটকে নানা বিষয়ে—আইন কিম্বা ডাক্তারি, নৌবিদ্যা কিম্বা জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব খুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ আছে যে, কোন কোন টীকাকারের মতে শেক্সপীয়ার বোধকরি কোন কালে কোন আইনজ্ঞের সহকারী ছিলেন, কারো মতে ডাক্তারের, আবার কারো কারো মতে স্বল্পকালের জন্য হলেও তিনি সমুদ্রগামী কোন জাহাজে নাবিকের কাজ করেছিলেন। শেক্সপীয়ার-জীবনের অনেক তথ্যই আমাদের অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে হয়তো এর কোন কাজই তিনি করেননি ; কিন্তু কবির কাছে কাব্য যে সত্যনিষ্ঠার দাবি করে, তারই খাতিরে এসব বিষয়ে তাঁকে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রে রসাত্মক বাক্যকেই বলেছে কাব্য। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে আরেকটি

কথা যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, রসাত্মক বাক্য যখন সত্যাত্মক হয়, তখনই তা সত্যিকারের কাব্য। অবশ্য বৈজ্ঞানিকের সত্যে এবং কবির সত্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিকের সত্য প্রমাণসাপেক্ষ, কবির সত্য কল্পনাসাপেক্ষ। Probability বা সম্ভাব্যতার সীমাকে যতক্ষণ লঙ্ঘন না করছেন, ততক্ষণ কবির কল্পনাকে মেনে নেওয়া বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও কঠিন নয়। আবার বৈজ্ঞানিক যখন ইন্দ্রিয়গোচর কোন ইঙ্গিত বা লক্ষণ দৃষ্টে বিজ্ঞানের কোন মূল সূত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁকে কবিসুলভ কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। কবি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়ের মনই কল্পনাপ্রবণ। তবে বৈজ্ঞানিকের কল্পনা ব্যাকরণের সূত্র মেনে চলে, কবির কল্পনা অনেক ক্ষেত্রে নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ তিনি অনেক সময়ে প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে ইনস্টিংক্ট-এর উপরে নির্ভর করেন। একথা নিশ্চিত যে, উভয়ের কল্পনাই সমান সিদ্ধিলাভ করে।

বিজ্ঞানের দুই মূর্তি—একটি আটপৌরে, একটি শৌখিন। যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অভাব মোচনের দায় গ্রহণ করেছে, সেখানে সে আটপৌরে আর যেখানে দায়মুক্ত হয়ে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত, সেখানে সে শৌখিন, কল্পনাবিলাসী। কাব্য এবং বিজ্ঞান সেখানে যমজ সন্তান। নিউটন, শেক্সপীয়ার, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ একই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী। যথার্থ কবি যেমন দার্শনিক, যথার্থ বিজ্ঞানীও তেমনি দার্শনিক। উভয়েরই কল্পনা যেমন অভ্রভেদী তেমনি অতলস্পর্শী। কিন্তু যে কারণেই হোক, বোধকরি দীর্ঘদিনের সংস্কারবশতই কবি এবং বৈজ্ঞানিককে আমরা ঠিক এক জাতের মানুষ বলে মনে করি না। এই সূত্রে মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে যথারীতি বিনয় সহকারে বলেছেন—

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কবির কথা কি কেবলমাত্র কথা—তার মধ্যে কোন সত্য নেই? কবির সত্য আর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের সত্য এক কিনা, তাই নিয়ে প্লেটোর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে অবিরাম তর্ক চলে আসছে। প্লেটোর মতামত পুরোপুরিভাবে আজ আর কেউ গ্রহণ করবে না। এই যুগে এটুকু অন্তত দেখা দেখা যাচ্ছে যে, কবি, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এঁরা একই সত্যের পূজারী, শুধু প্রকাশভঙ্গি আলাদা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'কবিতা বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।'

মানুষমাত্রেরই যেমন মেজাজ আছে, কাব্যেরও তেমনি মেজাজ আছে। আবার মানুষ যেমন সব সময় এক মেজাজে থাকে না, কাব্যও তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেজাজে দেখা দেয়। রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক মেজাজটাই পাঠকসমাজে সবিশেষ পরিচিত, অথচ ওখানে তিনি খুব যে একটা নতুন কথা বলেছেন এমন নয়, অন্ততঃ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে ওসব কথা খুব বেশি নতুন মনে হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের আরেকটা মেজাজ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, সেটি এর বৈজ্ঞানিক মেজাজ। এর মধ্যে আর কিছু না হোক একটু নতুনত্বের স্বাদ আছে।

কাব্যের মেজাজ মূলত কবির নিজের মেজাজ। কি করে এই মেজাজ গড়ে ওঠে,

প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রে সেই আলোচনা অত্যাবশ্যক। একথা সকলের জানা আছে যে, প্রত্যেক মানুষের মনের গড়ন শৈশব বা কৈশোরেই নির্ধারিত হয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে আহরণের ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু মূল গড়নের পরিবর্তন হয় না। এই গড়নটি নিয়েই কথা। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসাধক ছিলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শৈশব থেকেই একটি বিজ্ঞানের মেজাজ তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এ কাজে সহায়তা করেছেন স্বয়ং তাঁর পিতৃদেব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব অপরিসীম, এই কথাটি স্মরণ রাখলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা অনেকখানি সহজ হয়ে যায়।

দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি আখ্যা দিয়ে তাঁকে আমরা একটি ধর্মীয় আন্দোলনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। শিক্ষা প্রচারে তিনি যে বিদ্যাসাগরেরও পূর্বগামী সে কথা আমরা মনে রাখি না। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা। উক্ত সভাকে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে। এটি একটি আন্দোলন—জাতি গঠনমূলক আন্দোলনের প্রথম সূচনা। তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের অত্যল্পকাল পরে ১৮৪০ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে কলকাতার নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে—বাঁশবেড়ে, ব্যারাকপুরে এবং নদীয়া জেলার সুখসাগর গ্রামে এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ করবার বিষয় এই যে, এইসব বিদ্যালয় স্থাপনকালে তিনি বারংবার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে পদার্থবিদ্যার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এই কার্যে দেবেন্দ্রনাথের সহায়ক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবেই অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আপন পরিবারে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যেও বিজ্ঞান একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলের পড়ায় ফাঁকি দিয়েছেন কিন্তু গৃহশিক্ষককে খুব যে একটা ফাঁকি দিতে পেরেছেন, এমন মনে হয় না। নিজেই বলেছেন, মাস্টারের ঘড়িধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। কাব্য সাহিত্য তো ছিলই, সঙ্গে ছিল পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত ; আর ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত ; বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব হাতেকলমে পরীক্ষা করে শেখানো হত। মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র আসতেন শরীরের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। 'দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খটখট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়ে গিয়েছিল।' ছেলেবেলার বিজ্ঞানের পাঠ যে কবিকল্পনার সহায়তা করেছে গল্পগুচ্ছে 'কঙ্কাল' গল্প তার দৃষ্টান্ত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং পিতৃদেবের কাছে ডালহৌসি পাহাড়ে। ডাকবাংলোর আঙিনায় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে পিতাপুত্রে নক্ষত্র পরিচয়ের ক্লাশ বসত। 'তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন ; শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে

তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম।' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এটিই তাঁর জীবনের প্রথম গদ্য রচনা এবং সেটি বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর মনকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল, সে কথা তাঁর মনে ছিল। পরবর্তীকালে যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যালয়ের নিরতিশয় দরিদ্র জীবনযাত্রার মধ্যেও একটি দামি টেলিসকোপ সংগ্রহ করেছিলেন। জ্যোতিষ্কলোকের বিরাট বিস্ময় এবং বিশ্বরহস্যের উপলব্ধি-চেষ্টাকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। টেলিসকোপটির যাতে সদ্ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে অধ্যাপকের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিল। অধ্যাপকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে আনিয়েছিলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানী W.H. Hudson-এর The Green Mansions তাঁর অতিশয় প্রিয় গ্রন্থ ছিল। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি সে বই নিজে তাঁদের ক্লাসে পড়ে শোনাতেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবিনসন ক্রুসো নামক গ্রন্থকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। এরও মূলে আছে তাঁর স্বাভাবিক বিজ্ঞানপ্রীতি। জনমানবহীন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোকে নিষ্করুণ প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল মুখোমুখি বাস করতে হয়েছে। মনকে সারাক্ষণ সজাগ রেখে বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় প্রকৃতির বৈরিতা থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। মানুষ যে আপন বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতির সকল বিরোধিতাকে জয় করেছে, সেটাই তার সবচাইতে বড় গৌরব। পশুপক্ষী সকল প্রাণীকে গাত্রাবরণ, উদরান্ন এবং বাসস্থান সম্পর্কে প্রকৃতি দেবী অনেকাংশে নিশ্চিন্ত করে রেখেছেন। একমাত্র মানুষই নিরাবরণ, নিঃসম্বল হয়ে সংসারে আসে। তার অন্নবস্ত্র আবাস কোনটাই সহজলভ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন, মানুষকে সকল রকমে বঞ্চিত করে প্রকৃতি দেবী তাকে সবচাইতে বড় সম্মান দেখিয়েছেন। জীবন যাত্রার প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপিত করেছেন। এখানেই বিজ্ঞানের শুরু। প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মানুষের মনকে আবিষ্কারমুখী করে। কোন জিনিসের অভাবেই নিজেকে অসহায় মনে করে না, আপন বুদ্ধির প্রয়োগে প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিকল্প উদ্ভাবন করে। এই বিপদবারণ বুদ্ধিকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান বুদ্ধি। সম্পদকালের বুদ্ধিতে শখের প্রশ্রয় থাকে—যে শখ থেকে কাব্য শিল্পের জন্ম। আপৎকালের বুদ্ধি বিজ্ঞানমুখী।

এর মানে এই নয় যে, বিজ্ঞান শুধু বিপদকালের বন্ধু। বিজ্ঞানেরও যে একটি শৌখিন মূর্তি আছে, সে কথা আগেই বলেছি। সেখানে সে কাব্য দর্শনের সমগোত্রীয়। কিন্তু তার যে মূর্তিটির সঙ্গে আজকে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়, সেটি যন্ত্রবাহন মূর্তি। এখানে সে অসহায়ের সহায়। তাকে কেন যে যন্ত্রদানব বলে নিন্দা করা হয়, আমি জানিনে। তার বিরাট শক্তি নিয়ে সে মানুষের দোরে হাজির। বলছে, দরকার থাকে তো আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ো। এতে নিন্দার কি আছে? যন্ত্র কোন অপরাধ করেনি; মানুষই বরং বুদ্ধির দোষে যন্ত্রের অপব্যবহার করছে। রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক মনের নিন্দা করেছেন, কিন্তু যন্ত্রকে কখনো ঘৃণা করেননি। তাঁর বিখ্যাত গান 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র'র মধ্যে একটু হয়তো ব্যঙ্গের সুর আছে, তথাপি

যন্ত্রের প্রতি কোন অবিচার করেননি। তার 'ধ্বংসবিকট দন্ত'র কথা যেমন বলেছেন, তেমনি 'বিঘ্ন বিজয় পন্থে'র কথাও উল্লেখ করেছেন। যে জিনিষ মানুষের শ্রম লাঘব করেছে, তাকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। এছাড়া নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করার দিকে, তাঁর সহজাত ঝোঁক ছিল। সেই কতকাল আগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য আমেরিকা থেকে একটি জলতোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আর কিছু না হোক, ওই প্রকাণ্ড যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের খানিকটা আগ্রহ হবে। কিন্তু খুব কম ছেলেই ওটার দিকে তাকালে। ছেলেদের নিরৌৎসুক্য তাঁর মনকে পীড়া দিয়েছিল। চাষের ক্ষেত্রে ট্র্যাক্টরের ব্যবহারকে বরাবর উৎসাহ দিয়েছেন। কালিগ্রাম অঞ্চলে ট্র্যাক্টর চালিয়ে ধানক্ষেতে চাষ দিয়েছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ নিজে।

বিজ্ঞানবুদ্ধির সুপ্রচুর ব্যবহার এযাবৎ আমরা করিনি। আমাদের চিত্ত-দৈন্য এবং বৈষয়িক অসচ্ছলতার মূলে আমাদের অবৈজ্ঞানিক মন। রবীন্দ্রনাথ বারংবার এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, 'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রেখেছে।'

আমাদের পুরাণের গল্পে পৃথিবীকে বলা হয়েছে কামধেনু, ওর কাছে যে যা কামনা করে, সে তাই পায়। আমরা ওর কাছে কিছুই কামনা করিনি। ওর ভূমির উর্বরতায় যে আমাদের অন্নের সংস্থান, ওর ভূগর্ভে কত খনিজ সম্পদ, ওর বনে বনে কত ভেষজ দ্রব্য—এর কোন খোঁজই আমরা রাখিনি। আমরা মুখেই বলেছি কামধেনু। ওদিকে পশ্চিমের মানুষ সত্যি সত্যি পৃথিবীকে কামধেনু হিসাবে ব্যবহার করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের নিরৌৎসুক্যকে কঠিন ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিজ্ঞানসাধক ছিলেন না—'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ লেখা সত্ত্বেও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধির সঙ্গে যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি যুক্ত—এ কথা তাঁর জানা ছিল এবং এই কারণেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এমন অপরিসীম আগ্রহ। বিজ্ঞানচর্চাকে সারাজীবন সর্বপ্রকারে উৎসাহ দান করেছেন। এই সূত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যে কালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, সেকালে সমাজে যাঁরাই নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন জাতি সংগঠক। কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানসাধক, ধর্ম প্রচারক সকলেরই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে জগৎসভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল মন্ত্র জাতির মুক্তিকামনা। রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল জাতির মধ্যে যুগোপযোগী প্রাণসঞ্চারের ঐকান্তিক চেষ্টা। বিবেকানন্দ ধর্মীয় নেতা, কিন্তু জাতি-গঠনকেই তিনি ধর্মের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনাও আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পরিপোষক। আমি একাধিক প্রবন্ধে এ কথা বলেছি যে, অন্যান্য দেশে কবি, সাহিত্যিক অনেকাংশে দায়মুক্ত। তাঁরা নিজ নিজ সাধনা নিয়ে সারাজীবন

ব্যাপৃত থেকেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকরা এতখানি দায়মুক্ত ছিলেন না। দেশের দায়কে তাঁরা জীবনের বৃহত্তম দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জগদীশচন্দ্র যাতে একনিষ্ঠ চিত্তে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থেকে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা, অর্থ সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। এটি কেবলমাত্র বন্ধুকৃত্য নয়, তাঁর দেশসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভিক্ষাপাত্র হাতে ত্রিপুরা মহারাজের দ্বারে ধর্না দিয়েছেন। বলেছেন, 'জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব--ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য।'

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ফলে জাতির চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে, এই আশা পোষণ করতেন বলেই এতখানি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের সাফল্যকে তিনি যেভাবে সংবর্ধিত করেছেন, এমন আর কেউ নয়। এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারসমূহ বিশ্লেষণ করে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ শক্তিতে মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র লেখেন, 'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।'

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে কোন বিরোধ নেই, সে কথা আগেই বলেছি। কবি হয়েও তাঁর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাকে তিনি কাব্যসাহিত্য রচনায় কতখানি কাজে লাগিয়েছেন, এ আলোচনায় সেটাই অধিকতর জরুরী। একথা নিশ্চিত যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিত্বের ক্ষেত্রে কোন লোকসান ঘটায়নি। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। বলেছেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের গাঁথুনি নেই, কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।...অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে, সে তো অনুভব করিনে।'

আমি বলব লোকসান তো ঘটেইনি বরং খানিকটা অভিনবত্ব দিয়েছে। 'নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র' গানটির কথা আগে উল্লেখ করেছি। গানটির শব্দযোজনা এবং ধ্বনিমুখরতা অপূর্ব। পড়তে গিয়ে মনে হবে একটি কর্মমুখর যন্ত্রের চক্রধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—

কভু কাষ্ঠ-লৌষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘন পিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র ॥

ছেলেদের জন্যে লেখা 'উড়ো জাহাজ' কবিতায় অ্যারোপ্লেনের চিত্র যেমন কৌতকুপ্রদ শিশুদের পক্ষে তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক—

ওরে যন্ত্রের পাখী,
ওরে রে আগুন খাকী,
একি ডানা মেলি আকাশেতে এলি
কোন্ নামে তোরে ডাকি ?

আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রতি তাঁর যে একটি কৌতুকমিশ্রিত স্নেহ-প্রশ্রয় ছিল, এসব কবিতা তারই দৃষ্টান্ত। 'পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলাই সে তেমনি বলে' তাঁর উক্তি লৌহযন্ত্রকে উদ্দেশ করে। এছাড়া নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যকেও যে নিখুঁত কাব্যিক রূপ দেওয়া যায়, তারও দৃষ্টান্ত প্রচুর। শান্তিনিকেতনের জলকষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। ইদানীং সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। অনেক কাল আগে প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন করা হয়, তখন বেশ ঘটা করে তার প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়েছিল। কবি ওই উপলক্ষে একটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন—

হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল,
আছিল শৈলশিখরে শিখরে তোমার লীলাস্থল।

* *

শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে
কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার
গভীর তিমির তল।
আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়া,
কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল গগনের হারানো স্মরণ গানেতে
সমুচ্ছল ॥

অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত—

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না তাকে ॥

এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে—

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন।

সেই কতকাল আগে ইস্পাত নির্মাণের কল্পনা নিয়ে জামসেদজী টাটা গিয়েছিলেন ইয়োরোপে। ওদেশের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। কেউ উৎসাহ দেননি, অনেকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বজ্ঞ এক ইংরেজ পণ্ডিত বলেছিলেন, ভারতবর্ষে ইস্পাত তৈরি হবে তবেই হয়েছে! সে ইস্পাত আমি একাই এক ঢোঁকে গিলে খেতে পারব। (I'll be able so swallow it in one gulp) জামসেদজী যে কী অধ্যবসায়-বলে তাঁর স্বপ্নকে সফল করেছিলেন, সে রোমাঞ্চকর ইতিহাস আজ কারো অজানা নেই। সেই রোমাঞ্চের আভাস রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের ওই গানে। লক্ষ করবার বিষয় টাটা কোম্পানী এখনও অনেক সময় ওই গানটিকে তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন।

এসব গানে বিজ্ঞানকেই কাব্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাঁর ঋতুরঙ্গশালায় চঞ্চলা প্রকৃতির অফুরন্ত লীলার বিচিত্র বর্ণনা; কিন্তু কোথাও সত্যের অপলাপ নেই। বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে কবিত্বের অত্যুক্তি থেকে রক্ষা করেছে।

বালক বয়সে গ্রহনক্ষত্রের পরিচয় তাঁর মনকে যে নাড়া দিয়েছিল, কাব্যে তার প্রথম

প্রকাশ সন্ধ্যা সংগীতের কবিতা 'তারকার আত্মহত্যা'য়। একে অবশ্য পুরোপুরি বিজ্ঞান বিষয়ক কবিতা বলব না। নিতান্তই কবিত্ব করে বলেছেন, আপন দহনজ্বালায় দগ্ধ হয়ে তারকাটি আত্মহত্যা করেছে। বিজ্ঞান একথা শুনবে না। কিন্তু নির্বাপিত তারকার রহস্য যে বালক কবির মনকে আন্দোলিত করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। জ্যোতিষ্কলোকের অপার রহস্য আজীবন তাঁকে রোমাঞ্চিত করেছে। নানা বয়সের নানা কবিতায় এর উল্লেখ আছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করা তাঁর জীবনব্যাপী অভ্যাস। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোকদেবতার প্রথম প্রকাশ তাঁকে নিত্য রোমাঞ্চ দিয়েছে। "তোমার দেখা পাবার লাগি রাতারাতি স্তব্ধ আকাশ জাগে একা পূবের পানে বক্ষপাতি।" তাঁরও প্রতিদিনের প্রতীক্ষা ছিল এই শুভ মুহূর্তটির জন্যে। সেই অযুত বৎসর পূর্বে ধরণীর দেহে দেব দিবাকরের প্রথম কিরণসম্পাত তিনি কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ করতেন। বলতেন প্রতিদিন ঊষাকালে ধরণীর সেই প্রথম রোমাঞ্চেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পূরবীকাব্যের 'লিপি' নামক কবিতায় তারই অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
* *
বহু যুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে,
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।

জ্যোতিষ্কলোক সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা শেষ জীবন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সেঁজুতি গ্রন্থের 'চলতি ছবি' কবিতার একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি :

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।

অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। আর দু একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। প্রকৃতির মধ্যে নানা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে। সে কৌতুক তাঁর বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাকে চিরদিন উদ্দীপিত করেছে। ছড়ার ছবির 'পাথর পিণ্ড' কবিতা তাঁর অন্যতম দৃষ্টান্ত। সমুদ্রতীরে দেখেছিলেন আকাশকে ঢুঁ-মারা এক প্রকাণ্ড পাথরপিণ্ড। ওর ভীষণদর্শন আকৃতিটা দেখে কবির কল্পনা কিভাবে আন্দোলিত হয়েছে দেখুন—

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে'
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধনপাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।

বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারালো তার ছুটোছুটি, হারালো তার তাপ।
দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জমে।

(বিজ্ঞানীরা কি বলবেন জানি না কিন্তু) একে বোধকরি নিতান্ত কবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবার একটু পিছন ফিরে দেখা যাক। তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'অহল্যার প্রতি' যৌবন বয়সের রচনা। আপাতদর্শনে প্রাণহীন পাষাণ কি একান্তই নিষ্প্রাণ, নিঃসাড় ? বর্ষা বসন্তের ঋতুলীলায় সে কি তার অঙ্গে কোন রোমাঞ্চ অনুভব করে না ? কবির বিশ্বাস, করে। কিন্তু এ প্রশ্ন মূলত বিজ্ঞানের প্রশ্ন। এডওয়ার্ড টমসন্ এই কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন,—

'It is full of guesses, some of which science has already proved true, and others of which it may prove true hereafter.'

সৃষ্টির আদি রহস্য কবি, শিল্পীকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাসী। সৃষ্টিকার্যে স্বয়ং বিধাতারও হাত বড় পাকা ছিল না। অনেক স্থূলদেহ উদ্ভট সৃষ্টির পরে অবশেষে ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিদীপ্ত মানব সন্তানের জন্ম হয়েছে। এই তত্ত্বটি তাঁর অঙ্কিত একটি চিত্রে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে চিত্রের ব্যাখ্যা নিজেই করে দিয়েছে। তাঁর অপূর্ব ভাষায়, ছন্দে। কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ সহ সেটি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করছি—

এসেছে প্রথম যুগে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ
পঙ্কিল ধরণীপৃষ্ঠে। প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ
সৃষ্টির তিমির রাত্রে। ক্ষুদ্রতনু মানুষ তাহার
মনের আনিল দীপ্তি। সংশয় ঘুচিল বিধাতার

Life began its dubious chapter
With an exaggeration of flesh
The little man came to solve the
doubt from creator's mind.

বাঙলা গদ্যের স্বভাব-ধর্ম

সাহিত্যের মূল উপকরণ কথা এবং সব সাহিত্যই মূলত কথামালা—কথার পর কথা সাজিয়ে কথার মালা-গাঁথা। আবার কথা বলার সব চাইতে বড় গুণ হল গুছিয়ে-বলা। সুন্দর করে গুছিয়ে-বলার প্রয়াস থেকেই কাব্যসাহিত্যের জন্ম। আমরা যাঁদের কবিসাহিত্যিক বলি তাঁরা সকলেই কথাশিল্পী অর্থাৎ কিনা সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলার আর্টটিকে তাঁরা সযত্নে আয়ত্ত করেছেন। আদিযুগের সাহিত্য-শিল্পীরা সাজিয়ে বলতে গিয়ে কথাকে মিলের বন্ধনে বেঁধেছিলেন। শুনে নিজের কানেই মধুবর্ষণ করেছে, যারা শুনেছে তাদের কানেও। সেকালে পঠনক্ষম মানুষের সংখ্যা ছিল অতি কম; কবিরা তাঁদের কাব্য সুর করে পড়ে শোনাতেন। সুর করে পড়তে হলে ছন্দমিলের প্রয়োজন একটু হবেই। ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনে শুনে শ্রোতাদের মনে গেঁথে যেত। স্মরণ রাখার পক্ষে ছন্দের বন্ধন অবশ্যই সহায়ক ছিল। অনেকের মতে এ কারণেই সব দেশের সাহিত্যে পদ্য আগে, গদ্য পরে। পদ্যের আধিপত্য চলেছে বহুকাল। গদ্যের লয় বিলম্বিত এবং সে কারণে তার গতিও কিঞ্চিৎ বিড়ম্বিত। স্বল্পশিক্ষিতের পক্ষে ঠিকভাবে পড়া এবং অর্থ বোঝা কঠিন হত। রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাঙলায় অনুবাদ করেন তখন ভূমিকায় বলেছিলেন—'এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না।' এ শুধু বাঙলা ভাষার বেলায় নয়; অন্যান্য ভাষায়ও পাঠকরা প্রথম প্রথম এই অসুবিধা ভোগ করেছেন। আবার শুধু পাঠকরাই নন, গদ্যরীতি আয়ত্ত করতে লেখকদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। একথা নিশ্চিত যে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের প্রবেশ যেমন বিলম্বিত তেমনি দ্বিধাগ্রস্ত।

সব দেশেই দেখা গিয়েছে গোড়ার দিকে লেখক, পাঠক এবং শ্রোতা সকলেরই ঝোঁক ছন্দোবদ্ধ পদের প্রতি। গদ্যকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে ব্যবহার করবার কথা তাঁদের মনেই হয়নি; সেজন্য বেচারিকে বহুদিন অনাদরেই কাটাতে হয়েছে। সাহিত্য-শিল্পীরা এটুকু জানতেন যে রসাত্মক বাক্যকেই বলে কাব্য। কিন্তু রসের কথা যে গদ্যেও বলা যায় সে কথাটি আবিষ্কার করতে অনেক সময় লেগে গিয়েছে। এরও কারণ আছে। শিল্প মাত্রই—সাহিত্য হোক, সংগীত হোক, চিত্রকলা হোক—শৌখিন মনের সৃষ্টি।

প্রয়োজনের তাগিদ আর শখের তাগিদ ভিন্ন। প্রয়োজনের ভাবভঙ্গি কেজো মানুষের, কথাবার্তা চাঁচা-ছোলা, সাজসজ্জা আটপৌরে। শখের স্বভাব আলাদা। সে

কেবল প্রয়োজনটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত নয়—সেজেগুজে থাকে, রসিয়ে কথা বলে, নিজে আনন্দে থাকে, অপরকে আনন্দ দেয়। প্রথম যুগে যাঁরা সাহিত্যশিল্পের চর্চা করতেন তাঁরা ভাবতেন ছন্দোবদ্ধ, ঘননিবদ্ধ, সুসজ্জিত ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। গদ্য জিনিসটা কেবলমাত্র নিত্য-প্রয়োজনের ফাইফরমাশ খাটবে, মোটা রকমের কাজকর্ম চালাবে, কোন প্রকার পোশাকি কাজে ওকে লাগানো যাবে না। ফলে বহুদিন ওকে বহির্দ্বারেই অপেক্ষা করতে হয়েছে, সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পায়নি।

বাঙলা ভাষার চাইতে ইংরেজি ভাষার প্রসার-প্রতিপত্তি অনেক বেশি। কিন্তু সেখানেও গোড়ার দিকে গদ্য অনাদৃত। জন্মকাল মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দী কিন্তু পরিমাণে এত সামান্য যে কার্যত নগণ্য বললেই হয়। সে যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিরা গদ্যে লিখতে হলে ল্যাটিন ভাষাতে লিখতেন। ইংরেজি গদ্যের প্রতি অবজ্ঞা সুপরিস্ফুট। লক্ষ্য করবার বিষয় যে এলিজাবেথীয় নাটকে রাজারাজড়া, সভাসদরা কথা বলছেন পদ্যে, গদ্যের ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গণ্যমান্যরা শুধু হাসি-মশকরার জন্য গদ্যের ব্যবহার করেছেন। শেক্সপীয়ারের নাটকে এখানে-ওখানে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও তিনি প্রচলিত রীতিরই অনুসরণ করেছেন—অভিজাত চরিত্রের মুখে গদ্য পারতপক্ষে উচ্চারিত হয়নি। এলিজাবেথের কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতকে কিছু গদ্যকাহিনী রচিত হয়েছিল। লেখকরা সকলেই ছিলেন সে যুগের কবি নাট্যকার ; কাজেই তাঁদের গদ্যরচনা এত গদগদ যে তা না-গদ্য না-পদ্য। অথচ সে যুগেই বেকন একটি অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেছিলেন ; সেটি আজ পর্যন্ত ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে গণ্য। সেই জবজবে রস এবং গদগদ ভাষার যুগে যে এমন মেদলেশহীন ঋজু বলিষ্ঠ গদ্যের সৃষ্টি হতে পারে ভাবলে বিস্ময় লাগে। এ গদ্য একান্তভাবে বুদ্ধিজীবী, যুক্তিবাদী মনের সৃষ্টি। আশ্চর্যের বিষয়, সে যুগে আর কোন লেখক এ ভাষার অনুসরণ করেননি। তারও চাইতে বড় কৌতুকের কথা এই যে স্বয়ং বেকনও একে খুব একটা মূল্য দেননি। তিনি সারা জীবন ল্যাটিন ভাষাতেই লিখেছেন। বোধকরি নিতান্ত অবসর-বিনোদনের জন্যেই ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-পুস্তকটি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ঐ পুস্তকটির জোরেই আজ পর্যন্ত টিকে আছে। সপ্তদশ শতকেও কাব্যেরই আধিপত্য যদিও গদ্য-লেখকের সংখ্যা বেড়েছে। স্বয়ং মিলটন রাজনৈতিক বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে বহু পুস্তিকা প্রনয়ণ করেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দাবিতে লেখা *Areopagitica* বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। মিলটন ছিলেন মনেপ্রাণে কবি, গদ্য লিখেছেন বাধ্য হয়ে অগত্যা। অবজ্ঞা গোপন করেননি, বলেছেন গদ্য তাঁর বাঁ-হাতের লেখা। দেখা যাচ্ছে লেখকদের মধ্যে একদল ইংরেজির তুলনায় ল্যাটিনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, অপর দল কাব্যের তুলনায় গদ্যকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেছেন। ফলে গদ্যের অগ্রগতি প্রতিহত হয়েছে। বলতে গেলে অষ্টাদশ শতকে গিয়ে ইংরেজি গদ্য স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতককে বলা হয়েছে—the age of prose. কাব্যের চাইতে গদ্যসাহিত্যই তখন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর কারণ ততদিনে শিক্ষাবিস্তারের ফলে পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ঢের বেড়েছে। সেইসঙ্গে পাঠোপযোগী সামগ্রীর চাহিদাও বেড়েছে।

দেশ সম্বন্ধে, দুনিয়া সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল জন্মেছে। এরই চাপে সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়েছে, আর জন্ম হয়েছে এ যুগে সাহিত্যের সব চাইতে বড় শরিক উপন্যাসের। এককথায় এতদিনে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে এসে ইংরেজি-গদ্য যথার্থ সাবালক হয়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখ এই কারণে করছি যে একটি সুসমৃদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে তবেই আমাদের নিজ সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হবে। লক্ষ করবার বিষয় যে ইংরেজি গদ্যসাহিত্য অতিশয় ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে। জন্ম পঞ্চদশ শতকে, কাজেই এখন বয়স কম করেও পাঁচশো বছর ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাবালক হতেই তার তিনশো বছর কেটে গিয়েছে। সে তুলনায় আমাদের গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতি হয়েছে অভাবনীয় দ্রুতগতিতে। মনে হয় গ্রীক দেবী এথেনার (প্রজ্ঞা দেবীর) ন্যায় জন্মমুহূর্তেই পূর্ণযৌবনা। বয়স দুশো বছরও পূর্ণ হয়নি, এই সবে একশো পঁচাত্তর বছর তার বয়স। অতি স্বল্পকালের মধ্যে সে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। বিস্তারে বৈভবে ইংরেজি বা ফরাসি সাহিত্যের সমকক্ষ হয়েছে এমন কথা বলব না। তাহলেও গুণপনায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। এখন সে যে শক্তি অর্জন করেছে তাতে যে কোন দুরূহ বিদ্যার চর্চা করা তার পক্ষে সম্ভব, যে কোন জটিল বিষয়ের জট ছাড়াতে সে সক্ষম। যত বেশি কষ্টসাধ্য কাজে তাকে নিয়োজিত করা যাবে, হাড়ে-মাংসে-মজ্জায় সে তত বেশি সবল এবং পুষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমাবধিই কষ্টসাধ্য কাজে সে অভ্যস্ত হয়েছে এবং গোড়া থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। বাঙলা গদ্যের জন্মবৃত্তান্ত আজ অনেকের কাছেই খুব কৌতুককর মনে হতে পারে। কৌতুকের কথাটি এই যে, বাঙলা গদ্যেব জন্ম হয়েছিল ইংরেজের উদ্যোগে এবং তাদেরই প্রয়োজনে। এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা আপন স্বার্থেই বাঙলা ভাষা শিক্ষাব প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটছিল ; কিন্তু ভাষাশিক্ষা তাঁদের পক্ষে এই কারণে দুঃসাধ্য ছিল যে গদ্যভাষায় রচিত কোন বাঙলা পুস্তকই তখন ছিল না। আপন প্রয়োজনে ইংরেজরাই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হলেন। এছাড়া আরেকটি তাগিদও ছিল। ইংরেজ মিশনারি সাহেবরাও খ্রীস্টেব বাণী প্রচারের জন্য গদ্যভাষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উইলিয়াম কেরী প্রমুখ মিশনারি সাহেবদের উদ্যোগেই গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু (মথিলিখিত সুসমাচার)-এর বাঙলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮০০ সালে। এরও আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনসংক্রান্ত বিচার-সংক্রান্ত এবং রাজস্বসংক্রান্ত আইনকানুন বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সে অনুবাদও করেছিলেন বাঙলা ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরেজরা। বিবিধ আইনসম্বলিত ঐ পুস্তকই বাঙলা গদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

১৮০০ সালে স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—উদ্দেশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য ভারতীয় ভাষাশিক্ষাদানের ব্যবস্থা। দায়িত্বভার নিয়েছিলেন স্বয়ং উইলিয়াম কেরী। তিনি দেশীয় পাণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সহকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। তিনি তাঁদের বাঙলা গদ্যে ঠিক

স্কুল পাঠ্য পুস্তক নয়—পঠনোপোযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে নিয়োজিত করেছিলেন। রামরাম বসু দুখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'লিপিমালা'। দ্বিতীয় গ্রন্থখানা চিঠির আকারে লেখা নানা বিষয়ের আলোচনা। ভাষা সরল এবং কথ্যভাষা-ঘেঁষা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রন্থকার বলেছেন যে বিদেশী কর্মচারীদের বাঙলা কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত করা এবং দেশীয় জনগণের জীবন সম্বন্ধে বিদেশীদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে রচিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভূমিকায় স্পষ্টতই বলেছেন—'যুবক সাহেবজাতগণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত।' এসব উক্তি থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি একান্তভাবে ইংরেজদেব জন্যেই হয়েছিল। জিনিসটা আপাতদৃষ্টিতে যতখানি কৌতুককর প্রকৃতপক্ষে ততখানি নয়। কারণ যুবক সাহেবজাতগণ অব্যবহিত ফলভোগী হলেও সর্বকালীন ফললাভ দেশবাসীরাই করেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভাষা এবং সাহিত্য এক জিনিস নয়। যাঁরা আদিপর্বের ভাষা নির্মাণ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা যে সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না তারও প্রমাণ আছে—প্রবোধচন্দ্রিকার ভূমিকায়। বিদ্যালংকার মশায় একদিকে যেমন বলেছেন যুবক সাহেবজাতগনের শিক্ষার নিমিত্ত, অপরদিকে তেমনি আবার বলেছেন—'এবং কামকলা-কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্ত।' সাহিত্যের অঙ্কুর একথার মধ্যেই নিহিত ছিল কারণ রসের প্রসাদগুণে আনন্দ-পরিবেশন সক্ষম হলে তবেই ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।

মানুষের স্বভাব এবং মতিগতি যেমন অনেকাংশে নির্ভর করে তার শৈশব পরিচর্যার উপরে, ভাষার বেলায়ও তাই। সূচনায় যে-ভাবে তা গোড়াপত্তন হয় তারই উপরে নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং উৎকর্ষ। বাঙলা গদ্যের জন্মকথা যেটুকু বলেছি তারই মধ্যে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং এর মধ্যেই তার স্বভাবের বেশ একটু আঁচ পাওয়া যাবে। জন্ম হয়েছিল পরিণতবুদ্ধি সংসারাভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ জন্মমুহূর্তেই ওকে বয়স্কদের কথা ভাবতে হয়েছে; শৈশব কেটেছে পূর্ণবয়স্কদের নিয়ে, কাজেই আধ-আধ বুলি ওকে আওড়াতে হয়নি, ধরেই মুখে পাকা কথা বেরিয়েছে। দ্বিতীয়ত লিখন-পঠনের শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীরা যাতে দেশীয়দের সঙ্গে বাঙলা ভাষায় বাক্যালাপ করতে সক্ষম হয়। এজন্যে প্রথমাবধিই কথ্যভাষার দিকে খানিকটা ঝোঁক ছিল। রামরাম বসুর লিপিমালা এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে তার প্রমাণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তাঁরা যে এ বিষয়ে কোন গোঁড়ামি দেখাননি, এটি তাঁদের বাস্তব বোধের পরিচায়ক। এই যে গোড়া থেকেই আমাদের গদ্যভাষাকে সাংসারিক এবং ব্যবহারিক কাজে লাগানো হয়েতে তাতেই স্বভাবটি মোটামুটি কর্মকুশল এবং দেহের গড়ন মজবুত হতে পেরেছে। কেবলমাত্র শখের ব্যাপার হলে অন্যরকম হত। বাঙালিকে লোকে সাধারণত সেন্টিমেন্টাল বলে জানে। তার মুখে গদ্যের প্রারম্ভকালে গদগদ ভাষাই স্বাভাবিক ছিল। ইংরেজি গদ্যের জন্মকালে যে Euphuistic style-এর উদ্ভব হয়েছিল আমাদের ভাষায়ও গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে জলে-ডাঙায়-বাসকারী একটা উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারত। খুব ভাগ্যের কথা যে বাঙলা গদ্যে সে বিপত্তি ঘটেনি।

বাঙলা গদ্যের জন্ম অতি শুভ লগ্নে। লগ্নের অধিপতি স্বয়ং রামমোহন রায়।

একজন মহামনস্বী ব্যক্তি তাঁর বাক্যে-কর্মে-চিন্তায় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে চতুর্দিকে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন তার ধাক্কায় সমগ্র সমাজ ব্যগ্রব্যস্ত উচ্চকিত হয়ে ওঠে। মূক বাচাল হয় ; যে ভাষার মুখে বাক্যি ছিল না সেও মুখর হয়ে ওঠে। রামমোহনের প্রেরণায় সদ্যোজাত বাঙলা গদ্য যা করেছে তা দুঃসাহসিক তো বটেই, বিপ্লবাত্মকও বলা যেতে পারে। নিত্যদিনের ব্যবহারিক প্রয়োজন নিয়ে যে জিনিসের শুরু হয়েছিল দুদিন না যেতেই সে জ্ঞানচর্চায়, ধর্মজিজ্ঞাসায় মনোনিবেশ করেছে। রামমোহন যেদিন বেদান্তসূত্র বাঙলা গদ্যে অনুবাদ করলেন সেইদিনই আমাদের গদ্যভাষা শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ; ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নিগূঢ়তম তত্ত্বকে সে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গভীর সুরে গভীর কথা বলতে শিখেছে। এই ঘটনাকে বিপ্লবাত্মক বলছি এই কারণে যে, যে জিনিস ছিল অতি অল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রামমোহন তাকে সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মুষ্টিমেয়র মধ্যে যা আবদ্ধ তা লোপ পেতে বাধ্য। যত বেশি সংখ্যকের মধ্যে প্রচারিত হবে তত তার আয়ুবৃদ্ধি হবে। ইওরোপও একদিন এ সত্যটি বুঝতে পেরেছিল। সেখানেও মুষ্টিমেয় লাটিন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতরাই শুধু বাইবেল-পাঠের সুযোগ পেতেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়ুরোপের নানা দেশে নিজ নিজ ভাষায় বাইবেল-এর অনুবাদ হতে লাগল। জনসাধারণ সেই প্রথম বাইবেল-এর মর্মকথা জানবার সুযোগ পেল। জার্মেন ভাষায় বাইবেল-এর অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং মার্টিন লুথার। রিফর্মেশান আন্দোলনের সৃষ্টি সেই তখন। রামমোহনকৃত উপনিষদের অনুবাদকে বলা যেতে পারে আমাদের রিফর্মেশান আন্দোলনের সূচনা। তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার প্রকৃতপক্ষে এ দেশের রিমর্ফেশান আন্দোলন। ইয়ুরোপে রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশান একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে, মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে। আমাদের দেশেও দুই আন্দোলন একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে রিফর্মেশান-জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যতখানি, পরোক্ষ প্রভাব তার চাইতে ঢের বেশি। রিফর্মেশান মানুষের মনকে নানাবিধ অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানুষের চিন্তাকে অর্গলমুক্ত করেছে। বিভিন্ন মতাবলম্বীরা নিরন্তর তর্ক করেছেন। যত বেশি তর্ক চলেছে, ভাষা তত বেশি সতর্ক হয়েছে, সচকিত হয়েছে। ভাষা এবং সাহিত্য দুয়েরই তাতে পুষ্টিসাধন হয়েছে।

মিশনারি সাহেবরা যখন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মে অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট তখন রামমোহন যুক্তিদ্বারা তাঁদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। এছাড়াও সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারকল্পে তিনি বহু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। সেখানেও যুক্তিদ্বারাই আপন মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। যুক্তিতর্কের যোগ্য বাহন গদ্য। বাঙলা গদ্যের পরম সৌভাগ্য যে জন্মক্ষণেই রামমোহনের ন্যায় যুক্তিবাদী মহামনস্বীর কাছে সে দীক্ষালাভ করেছে।

রামমোহনের অনতিকাল পরে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। শৈশবেই এরূপ দুই মহামনস্বী ব্যক্তির পরিচর্যা লাভ করা খুব কম ভাষা বা সাহিত্যের ভাগ্যেই ঘটেছে। দুজনেই সমান মনস্বী, সমান যুক্তিবাদী। রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরকেও নানা বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। তাঁর 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' এবং 'বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শাস্ত্রীয় তর্কের ক্ষেত্রে

তাঁর বহু রচনা আছে। যুক্তিতর্কের প্রয়োগ মনের পক্ষে যেমন ভাষার পক্ষেও তেমনি ডিসিপ্লিনের কাজ করে। যুক্তির বাঁধুনি না থাকলে ভাষা শিথিল হতে বাধ্য। বাঙালির স্বভাবে একটা ঢিলেঢালা ভাব আছে; খুব আশ্চর্যের বিষয় যে বাঙলা গদ্যের স্বভাবে সেই ঢিলেঢালা ভাবটা ছিল না। গোড়া থেকেই ওর কথায় আঁটসাট বাঁধুনি। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে এযাবৎ তাকে প্রয়োজনসিদ্ধিতেই ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে ভাষার প্রকৃত সিদ্ধিলাভ তখনই হবে যখন সাহিত্যের বাহন হিসাবে অর্থাৎ রসসৃষ্টির কাজে তাকে ব্যবহার করা হবে। শিল্পে ব্যবহারের জন্য অশোধিত খনিজ পদার্থকে যেমন শোধন করে নিতে হয় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ভাষাকেও তেমনি শোধন করার প্রয়োজন আছে। আগেই বলেছি প্রয়োজন-মেটানো আর শখ-মেটানো এক কথা নয়। প্রয়োজনের গৃহস্থালি ছাড়িয়ে যেখানে মনের স্বচ্ছন্দ বিচরণভূমি, যেখানে বিলাসব্যসন-আনন্দের আয়োজন, সেখানে সাহিত্যের জন্ম, সেই তার লীলাভূমি। সযত্ন পরিচর্যায় বর্ধিত হয়ে চারাগাছটি একদিন ডালপালা ছড়িয়ে আকাশে হাত বাড়ায়, ফুলে-ফলে শোভিত হয়। আমাদের গদ্য সাহিত্যের প্রথম কুঁড়িটি ফুটিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বলে নেওয়া প্রয়োজন যে বর্ণপরিচয়-এর মাধ্যমে সমগ্র বাঙলা দেশের হাতে-খড়ি হয়েছে বিদ্যাসাগরের হাতে। বাক্যের গঠনবিন্যাস তিনিই শিখিয়েছেন। ভাষার বাঁধুনি-গাঁথুনির প্রথম পাঠ আমরা পেয়েছি বোধোদয়, কথামালার পাতায়। পরে খাঁটি সাহিত্যিক মূর্তি নিয়ে বাঙলা গদ্য প্রথম দেখা দিয়েছে 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস'-এ। সাহিত্যের বাহন হতে গেলে ভাষাকে নানা কলাকৌশল অর্জন করতে হয়। বিদ্যাসাগরের ভাষাতেই আমরা সর্বপ্রথম সেই কলানৈপুণ্য বা প্রসাদগুণের সাক্ষাৎ পাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়--'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন।...তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'

বাক্যের গঠন সম্পর্কে একটি কথা এখানে বলছি। 'শেষের কবিতা' যখন প্রকাশিত হয় তখন উক্ত গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি—অমিত রায় ব্যারিস্টার—উদধৃত করে একজন আধুনিক সাহিত্যিক বলেছিলেন, এতদিনে একটি বাঙলা বাক্য পাওয়া গেল যার মধ্যে ক্রিয়াপদ নেই। বলাবাহুল্য সাহিত্যিক বন্ধুটি না ভেবে-চিন্তে তাড়াহুড়া করে কথাটা বলেছিলেন। গদ্য-রচনার প্রারম্ভকালেই বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে—গোপাল বড় সুবোধ বালক—বাক্যটি ক্রিয়াপদ ছাড়াই রচনা করেছিলেন। গোড়ার দিকে সকল জিনিসের মধ্যেই একটু rigidity বা আড়ষ্টতা থাকে। আস্তে আস্তে জট ছাড়িয়ে তাকে সহজ করে নিতে হয়। ক্রমবিকাশে জন্যে যে গুণটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন সেটি হল flexibility বা সাবলীলতা। সেজন্যে ভাষার পক্ষেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনের অনায়স ক্ষমতা অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন অংশগুলির সহজ এবং স্বচ্ছন্দ বিন্যাসের কৌশল আয়ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। এ কৌশলটি বিদ্যাসাগরই আমাদের শিখিয়েছেন। এক কথায় রামমোহন যে ভাষাকে সচকিত করে দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে অনেক বেশি সপ্রতিভ করে দিয়েছেন।

'বিদ্যাসাগরী বাঙলা' বলে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা শিক্ষিত মহলে প্রচলিত আছে। ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতাবশতই এরূপ কথার প্রচলন হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ মোটা রকমের কাজে ব্যবহৃত অর্থাৎ গুরুতর কাজে

অনভ্যস্ত ভাষাকে সুবিন্যস্ত সুরুচিসম্পন্ন ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে নেওয়া কিংবা সাধারণের অপরিচিত আভিধানিক শব্দের গুমর ভাঙিয়ে তাকে ঘরোয়া ব্যবহারে লাগানো যে কী কঠিন কাজ আমাদের পক্ষে আজ তা বোঝা সহজ নয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁর ভাষায় আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে এ বিষয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না ; বরং ভাষা প্রয়োগে আশ্চর্য সংগতিবোধ প্রকাশ পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। 'কথামালার'র গল্পে বলছেন—'এক দুঃখী নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল।' সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ প্রাকৃত শব্দ (ফস্কিয়া) ব্যবহার করা তখনকার দিনে খুব সহজ বা স্বাভাবিক ছিল না। বেশ বোঝা যায় বিষয় বিচার করে তিনি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বিদ্যাসাগরের বাঙলা পড়ে অবজ্ঞাভরে বলেছিলেন—ছাই লিখেছে, সবই তো বোঝা যায়। আজ যাঁরা বিদ্যাসাগরের ভাষাকে পণ্ডিতি ভাষা বলে জাতে ঠেলেছেন তাঁরাও পূর্বোক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় ভাষার স্বভাব এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে সমান অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাই বলে বিদ্যাসাগরের গদ্যকে সর্বার্থসাধিকা ভাষা বলব না। তখনও বহুবিধ গুণ অর্জন করতে বাকি ছিল। জীবজগতে যে ক্রমবিকাশের ধারা প্রবহমান, ভাষার জীবনেও তাই। বাঙলা গদ্যের দেহে তখনও যৌবনের লক্ষণাদি পরিস্ফুট হয়নি। যৌবনলীলার প্রথম প্রকাশ বঙ্কিমের লেখনীতে—তাঁর রোমাঞ্চকর রোম্যান্স-কাহিনীর পাতায় পাতায়। কাব্যের ন্যায় গদ্যও যে প্রাণকে মাতিয়ে তুলতে পারে, এ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাঙালি পাঠকের সেদিনই প্রথম হল।

কিন্তু তার আগে দু একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশে যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যাসাগর-জন্মের আগে রামমোহনের যুগেই একটি মস্ত বড় ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হল বাঙলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের প্রকাশ। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক সাপ্তাহিকপত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। লক্ষ করবার বিষয় যে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার মতো প্রথম সাময়িকপত্রের প্রকাশও ইংরেজের উদ্যোগেই হয়েছিল। পরে রামমোহন এবং দেশীয়দের উদ্যোগে আরো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এসব পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য ঘটনাদি ছাড়াও নানাবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা এবং কৌতুককর কাহিনী পরিবেশিত হত। পত্রিকাগুলি অল্পদিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যদিচ পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। একথা ঠিক যে এযাবৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাদি যা করতে পারেনি এসব সংবাদপত্র তাই করেছিল। অর্থাৎ বাঙলা গদ্যের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের সাক্ষাৎপরিচয় সংবাদপত্রের মাধ্যমেই ঘটেছিল। রামমোহনের অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। প্রধানত নীতিধর্মমূলক পত্রিকা হলেও তাতে নানা তথ্যমূলক প্রবন্ধাধি প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান-আলোচনার প্রবর্তক তিনি। তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ভাষাকে বিজ্ঞান-আলোচনার উপযোগী করে নেবার কৃতিত্ব প্রধানত অক্ষয়কুমারের। সে সময়কার অপর এক বিখ্যাত সাময়িকপত্র

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়াও ঐ পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সমসাময়িক সাহিত্য-আলোচনা। সাহিত্য-সমালোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে পথিকৃৎ বলা চলে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইংরেজি গদ্যের জন্ম হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচলন হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওদের যেখানে লেগেছে তিনশ বছর, আমাদের সেখানে কুড়িটি বছরও লাগেনি। উপন্যাসের বেলায়ও তাই ঘটেছে। ইংরেজি উপন্যাসের জন্মও অষ্টাদশ শতকে। অর্থাৎ সেই তিনশ বছরই লেগেছে। আমাদের প্রথম গদ্যগ্রন্থ প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) আর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)—এ দু-এর মধ্যে ব্যবধান মাত্র চৌষট্টি বছরের। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের গল্পসাহিত্যের অগ্রগতি হয়েছে তড়িৎ-গতিতে।

বিদ্যাসাগরের সমকালীনদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাচর্চায় উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু নিজে গ্রন্থরচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না যদিচ তাঁর ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান স্বচ্ছ চিন্তা এবং স্বচ্ছন্দ ভাষার গুণে এই সময়ে অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর আত্মজীবনী ভাষার ঔজ্জ্বল্যে আজকের পাঠককে চমৎকৃত করে। তিনি একটা নিজস্ব লিখনভঙ্গি বা স্টাইলের স্রষ্টা ; সেটি সাহিত্যের প্রসাদগুণে প্রসন্ন। লক্ষ করবার বিষয় যে এক বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে তাঁর সমকালীন লেখকরা প্রায় সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ণ মায় টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র সকলেই হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। হিন্দু কলেজ ছিল ইংরেজিয়ানার পীঠস্থান কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁরা সকলেই মাতৃভাষার সেবায় অল্পবিস্তর তৎপর ছিলেন। মনে হয়, একটি মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়ার ফলে তাঁরা মাতৃভাষার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরা আবেকটি কাজও করেছিলেন। বাঙলা গদ্যকে তাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছিলেন। এমন যে মাইকেল, কাব্যরচনাকালে মিলটনি ঢঙ-এ জলদগম্ভীর স্বরে কথা বলেছেন, গদ্যনাট্যে দিব্যি সরল স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এ যাবৎ বাঙলা গদ্যকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রধানত তিন উদ্দেশ্যে। প্রথমত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ত ধর্মীয় বা সামাজিক বাদানুবাদে নিজ-নিজ মতপ্রচারের উদ্দেশ্যে। পরে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসে বাঙলা গদ্যকেই প্রধান সহায়রূপে দেখা হয়েছে। যাকে যে কাজে লাগানো যায় তার স্বভাব অনেকটা সেভাবে গড়ে ওঠে। এজন্যে গোড়ার দিকে মনে হয় ও যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির, মুখে নীতিধর্মের কথাটা একটু বেশি। তাই বলে সে যুগের লেখকরা অরসিক ছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বিদ্যাসাগরের মুখের কথায় যেমন লেখার ভাষায়ও তেমনি যথেষ্ট wit-এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলেও রসসাহিত্য বলতে ঠিক যা বোঝায় তখনও তার সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ বিদ্যাসাগর-সদৃশ মনস্বীদের কৃপায় আমাদের ভাষার সবলতা যতখানি বেড়েছে সাবলীলতা ততখানি নয়। ভাষা যত বেশি পরিণত হবে তার flexibility তত বেশি বাড়বে। ভাষার দেহ বলে একটা জিনিস আছে। সে দেহ শুধু অস্থি-সবল হলেই হবে না, তার মধ্যে একটি কোমলতা

থাকবে যাতে তার দেহভঙ্গি সহজ স্বচ্ছন্দ এবং শোভন হয়। রসসৃষ্টির জন্যে দেহের একটু লীলাভঙ্গি চাই। রমণীদেহকে যেমন বলে দেহবল্লরী, ভাষার দেহটিও তেমনি বল্লরীসদৃশ সহজ ভঙ্গিতে হেলতে দুলতে নাচতে শিখবে। কখনো হাসিতে গড়িয়ে পড়বে, কখনো কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। দেহের চিকন লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে সময় লাগে। তাছাড়া গুরুগম্ভীর কথা যত সহজে বলা যায়, রসের কথা তত সহজে নয়। সেজন্যে ভাষার স্বভাবকে তৈরি করতে নিতে হয়—একটু চটুলতা চপলতা মুখরতার অভ্যাস করতে হয়।

প্রয়োজনের তাগিদ মিটলে তবে মানুষ শখের কথা ভাবতে শুরু করে। বিদ্যাসাগরের কাল থেকেই বাঙলা গদ্য বেশ একটু তালেবর হয়ে উঠেছে—মনে শৌখিনতার আমেজ এসেছে। ভূদেববাবু তখনই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীকে হৃদয়গ্রাহী করতে হলে ভাষাকে যতখানি সহৃদয় হতে হয় বাঙলা গদ্য তখনো ততখানি হয়নি। একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেনি। বলতে গেলে একই সময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) যখন 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখলেন তখন ভাষার সরসতা অনেকখানি ফুটে উঠল। সাধুভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিশেল দিয়ে তিনি ভাষার আড়ষ্টতা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ করবার বিষয় যে কথ্যভাষার দিকে বাঙলা গদ্যের একটা ঝোঁক গোড়া থেকেই চলে আসছে। এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' আগাগোড়াই সাবেকি কলকাতার কথ্যভাষায় লেখা। গ্রন্থটি কলকাতার সামাজিক জীবনের (বিশেষ করে ধনী সমাজের) একটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র। ব্যঙ্গরচনায় এটিকেই বাঙলা গদ্যের প্রথম উদ্যম বলা চলে।

দেখা যাচ্ছে বাঙলা গদ্য এখন বাঁধা পথ ছেড়ে নানাদিকে, নানাভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে। এক কথায় সে এখন প্রকৃত সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। সাহিত্য হল বিচিত্রার লীলাভূমি। সেখানে নব নব রূপে নব নব রসের অবতারণা। সেই বৈচিত্র্যের সঙ্গে বাঙলা কাব্যের পরিচয় ঘটেছে বহুপূর্বে। যে ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হয়েছে সে ভাষায় কোমলের-মধুরের অভাব ছিল না, ভক্তিরস-প্রেমরসেরও কমতি ছিল না। কাব্যের যে লীলায়িত ভঙ্গি, রসের কথা বলতে গেলে গদ্যেও কিছু তার প্রয়োজন হয়। যে সময়ের কথা বলছি বাঙলা গদ্যে তখনও সেই কমনীয়তা বা লালিত্য আসেনি। সে অভাব পূরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্ণযৌবনা ভাষার লীলায়িত ভঙ্গি তাঁর লেখনীতেই প্রথম ফুটে উঠেছে।

বলা আবশ্যক যে প্রত্যেক জাতির কতকগুলি মূলগত বৈশিষ্ট্য (ethnical characteristics) থাকে। তার ছাপ মানুষের মুখাবয়বে, দেহাবয়বে প্রকাশ পায়। ভাষার বেলায়ও তাই, তারও কতগুলি মূলগত বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালি জাতি যেমন নানা জাতির মিশ্রণে গঠিত, তার ভাষায়ও নানা ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। পূর্বগামীরা—বিশেষ করে বিদ্যাসাগর—বাঙলা ভাষার স্বভাবধর্মের প্রতি লক্ষ রেখেই বাঙলা গদ্যের অবয়বটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তার সুস্পষ্ট বাঙালি মুখশ্রীটি শিল্পীর তুলিতে সর্বপ্রথম ফুটিয়ে তুললেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভাষার মুখে শ্যামল কোমল বাঙালি মুখের লাবণ্য ফুটে উঠল। বঙ্কিমের বহুনিন্দিত গুরুচণ্ডালি দোষ সংস্কৃতের বাঁধনকে আরেকটু ঢিলে করে দিয়েছিল। তাতে ভাষা কিছু অমার্জিত হয়নি অথচ কথা

বলার ঢংটা আগের চাইতে ঢের-বেশি ঘরোয়া মনে হয়েছে। তিনি যখন মানুষের সুখ-দুঃখ, নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ, চিরকালের বিরহমিলনকথা নিয়ে মনোহারী কাহিনী রচনা করতে বসলেন তখন প্রয়োজনের তাগিদেই ভাষার কিছু রূপান্তর ঘটল। এ জাতীয় জিনিস রচনা করতে গেলে একটু অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে হয়। সে জন্যে ভাষার আঁটসাঁট বাঁধনগুলিকে একটু আলগা করে দেওয়া প্রয়োজন নইলে সেই অন্তরঙ্গ সুরটি ঠিক ফুটে ওঠে না। গুরুচণ্ডালি দোষ সে কাজে সহায়তা করেছে। সেজন্যে দোষ না বলে তাকে গুণ বলাই ভালো।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে চিত্তচমৎকারিণী প্রণয়কাহিনী লিখেছেন এমন নয়, ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুগম্ভীব আলোচনা করেছেন। বিষয় যতই দুরূহ হোক, ভাষার প্রাঞ্জলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কমনীয়তা এবং বলিষ্ঠতা—এ দুই গুণেরই সার্থক সমন্বয় ঘটেছে তাঁর ভাষায়। তাঁর হাতে পড়ে ভাষার দেহটি এতখানি supple হয়েছে যে বিষয়ভেদে যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সেইভাবে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে মানবহৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-ভক্তি প্রকাশের জন্য যেটুকু আর্দ্রতার প্রয়োজন সেটুকু অবশ্যই ছিল, কিন্তু অনাবশ্যক ভাবোন্মাদনায় সে ভাষাকে কোথাও তিনি জলো কালো করেননি।

বঙ্কিম বাঙলা গদ্যকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে দিগন্ত অবধি সমস্ত পথ তার কাছে উন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এসে সে দিগন্তকে আরো প্রসারিত করলেন, শব্দের লালিত্যে ভাষাদেহের লাবণ্য বাড়ল, চিন্তার গভীরতায় মনের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল। রবীন্দ্রনাথ কবি মানুষ, ছন্দ-জ্ঞান মজ্জাগত। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে। ইংরেজ লেখক বলেছেন, Prose also has its cadences—এ খুব খাঁটি কথা। সব উন্নত ভাষাতেই এটি অল্পবিস্তর আছে। বিদ্যাসাগরের বাক্যগঠনে আমরা প্রথম এর আভাস পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে তা স্পষ্টতর হয়েছে। 'সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর'—এ বাক্যের rhythm বা ছন্দ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে শুধু কাব্যগুণ নয়, কারুশিল্পীসুলভ craftsmanship এর পরিচয় সর্বত্র। একে কবি, তাতে রোম্যাণ্টিক কবি—ভাষায় আতিশয্য-প্রকাশের আশঙ্কা অবশ্যই ছিল কিন্তু স্বভাবজাত মাত্রাবোধ তাঁকে গদগদভাষণ থেকে রক্ষা করেছে। স্বভাবত যুক্তিবাদী, চিন্তাশ্রয়ী এবং মনস্বী ব্যক্তি বলে কোথাও ভাষার শিথিলতা বা অতিশয়তা নেই। ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সচেতন খুব কম লেখকই ততখানি। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন এবং এত বিচিত্র বিষয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে, বিষয়ভেদে ভাষার পার্থক্য এবং শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছে। মানবিক প্রেম এবং ভগবৎপ্রেম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, পার্থিব সৌন্দর্য এবং অপার্থিব সৌন্দর্য, আর্থিক লাভক্ষতি এবং পারমার্থিক লাভক্ষতি অভিন্ন বস্তু নয়। দুইয়ের ভেদ শব্দদ্বারাই প্রকাশ করতে হয়। কবিসুলভ সূক্ষ্মতম অনুভূতিপ্রবণ মন থাকলে তবে সেই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করা সম্ভব।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুরা লক্ষ করেছেন কিনা জানি না যে সতেরো-আঠারো বছর বয়সে লেখা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' বালক রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনায় যে শক্তিমত্তার পরিচয়

দিয়েছেন, ঐ বয়সের বা যৌবনারম্ভেই কোনো কাব্যগ্রন্থে ততখানি শক্তির পরিচয় নেই। কলম ধরেই এরূপ গদ্যরচনা বিস্ময়কর। এই ভাষারই পূর্ণ পরিণতি জ্বলজ্বলে ঝলমলে রূপ নিয়ে পরে দেখা দিয়েছে ছিন্নপত্রের পাতায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা হল, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'ই কথ্যভাষায় লেখা প্রথম খাঁটি সাহিত্যগ্রন্থ। এই সম্পর্কে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষায় খুব চমকপ্রদ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। কাব্যে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দপ্রয়োগ—চলিনু, কহিনু, শুনিনু, মম, তব ইত্যাদি—ইংরেজিতে যাকে বলে poetic diction —ক্রমে-ক্রমে তিনি সে-সব ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য ছন্দের বৈচিত্র্য প্রচুর ; শেষপর্বে গদ্যছন্দের ব্যবহার। কিন্তু ছন্দে যতখানি বৈচিত্র্য, ভাষায় ততখানি বৈচিত্র্য নেই। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত পদলালিত্যের প্রতি সমান ঝোঁক। অপর পক্ষে গদ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে 'চতুরঙ্গ' থেকে শুরু করে (বলা যেতে পারে সবুজপত্রের যুগ থেকে) শেষদিকের গল্প-উপন্যাসে তিনি এক নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। আদিপর্বে ভাষা যেমন সুললিত, অন্ত্যপর্বে আবার তেমনি শাণিত। এমন চকচকে ঝকঝকে ধারালো ভাষা ইতিপূর্বে আর কোনো লেখক ব্যবহার করেননি। বাক্যচ্ছটা তেমন-তেমন পাঠককেও হকচকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে অসামান্য ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও এ ভাষা প্রকৃতপক্ষে একটু tilted অর্থাৎ কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক। এ ভাষায় সত্যি-সত্যি লোকে কথা বলে না। অমিত রায়ের বোনেরা যেমন বলেছিল, ও সকালে উঠেই সারা দিনের জন্যে শানিয়ে বলা কথা সব বানিয়ে রেখে দেয়, এ ভাষাও তেমন বানানো, স্বাভাবিক নয়। তবে একথাও মানতে হবে যে তিনি ভাষার বাক্‌চাতুর্য এবং উইট-এর ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাঙালির স্বভাবে একটি lyrical quality আছে, বাঙলা ভাষায়ও সে গুণটি বর্তমান—একটি তরল টলটলে ভাব, বাঙালি মেয়েদের মুখে যেমন একটি ঢলঢলে লাবণ্য ঠিক তেমনি। বাঙলা কাব্যে তার সুপ্রচুর প্রকাশ আমরা দেখেছি। ভাষাটাই আবেগময়ী, কাব্যধর্মী এবং আমাদের কাব্যে একটু বেহিসেবি রকমেই তার ব্যবহার হয়েছে। ক্লাসিকাল রীতিতে আবেগহীন সংযত সংহত ভাষায় লেখা কবিতা আমাদের ভাষায় কম। সাম্প্রতিক কালের কবিদের ভাষান্তর এবং রূপান্তর লক্ষ করা যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের গদ্যে ওই lyrical quality-র চর্চা যতখানি হতে পারত তা হয়নি। কারণটার আভাস আগেই দিয়েছি। জন্মকাল থেকে আমাদের গদ্যকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুতর কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে। বিনা কাজে, বিনা উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্যে গদ্যের ব্যবহার খুব একটা করা হয়নি। গান বা গীতিকবিতা যেমন উদ্দেশ্যহীন, ভারমুক্ত মনের ক্ষণকালীন উচ্ছলতা বা আনন্দের প্রকাশ, সুগঠিত গদ্যেও তা হতে পারে। ডক্টর জনসন এ জাতীয় গদ্যরচনাকে বলেছিলেন—a sudden sally of the mind। মনের সঞ্চিত চিন্তারাশির খানিকটা যখন আপনা-থেকে উপচ পড়ে তখন বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হয়ে সে গদ্য অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ফরাসিরা একেই বলেছে—belles letters দায়শূন্য নিরুদ্বেগ মনে লেখার খেলা। তেমন-তেমন শিল্পীর হাতে পড়লে এ জিনিস অপূর্ব রসের সৃষ্টি করতে পারে। ফরাসি এবং ইংরেজি গদ্যে এ জাতীয় প্রবন্ধ গর্বের বস্তু।

বঙ্কিম যখন কমলাকান্তের দপ্তর লেখেন তখন গুরুতর কর্মভার ত্যাগ করে আপন মনকে যেমন ছুটি দিয়েছিলেন ভাষার রাশটাও তেমনি একটু আলগা করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে 'বাজে কথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ নামটির মধ্যেই এ জাতীয় রচনার স্বভাবসম্মত পরিচয় আছে। নিজেই বলেছিলেন এসব প্রবন্ধের মূল্য বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়, রসসম্ভোগের আনন্দে। গদ্যে যে lyrical quality-র কথা বলেছি তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'। কোথাও অযথা কাব্যিয়ানা নেই, কিন্তু কবিসুলভ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষায় যে nuance বা বর্ণবৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় রবীন্দ্রনাথই আমাদের গদ্যে সেই বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছেন। বেল্‌লেতর বা রম্যরচনার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভাষায় এ জাতীয় রচনা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেনি। হালকা সুরে একটি কৌতুকরসের সৃষ্টি করতে পারলেই আমরা তাকে রম্যরচনা নামে অভিহিত করি। আমাদের মতে সে জিনিস রম্যরচনা হতে পারে কিন্তু ওদের বেল্‌লেতর অনেক উঁচুদরের জিনিস, খাঁটি সাহিত্য, আবার একথাও বলব যে বাঙলা ভাষার প্রতিভা বিশেষভাবে belles letters-এর উপযোগী।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি নানাভাবেই বাড়িয়েছেন, তবে এক দিকে বেশ একটু ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। শিক্ষিত মার্জিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষাই বরাবর ব্যবহার করেছেন। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে, চাষি মজুরকে দেখেছেন ভালোবেসেছেন, সারাজীবন তাদের কথা বলেছেন, ভেবেছেন, কিন্তু তাদের মুখের ভাষায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে লৌকিক ইডিয়াম তার প্রতি তিনি নজর দেননি। বলে নেওয়া ভালো যে আমি আঞ্চলিক ডায়েলেক্‌ট-এর কথা বলছি না। সেটা খুব বড়.জিনিস নয়। ইডিয়াম সম্পূর্ণ আলদা জিনিস, সাধারণের জীবন থেকে উদ্ভূত ভাষার মজ্জাগত পদার্থ। এরূপ ইডিয়ামজাত শব্দ বা বাক্যাংশ অতিশয় expressive, কিন্তু এ জিনিসটা রবীন্দ্রনাথের মনকে কখনো টানেনি। একটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাঁর সংগৃহীত ছেলে-ভুলানো ছড়ায় কন্যা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে—বাড়িসুদ্ধ সবাই কাঁদছে। যে বোনের সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া লেগেই থাকত বিচ্ছেদবেদনায় সেও কাঁদছে। বাঙালি ঘরের অতি পরিচিত সংসারচিত্র। ছড়াটিতে আছে—

বোন কাঁদছে, বোন কাঁদছে খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছে ভাতারখাকী বলে।

'ভাতার' কথাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে অতিশয় অশালীন মনে হয়েছে। তিনি ভাতার-খাকী স্থলে স্বামীখাকি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দেশজ ইডিয়াম সম্বন্ধে যাঁর ধারণা আছে তিনিই বলবেন যে এখানে 'ভাতার' কথাটি যেমন লাগসই বা appropriate 'স্বামী' কথাটি মোটেই তেমন নয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলা ইডিয়াম সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিলেন। সাধারণে প্রচলিত নিত্যব্যবহৃত নানা expression তিনি খুব জুতসই-মতো তাঁর লেখায় ব্যবহার করতেন। অবনীন্দ্রনাথ লেখক-জীবনের আরম্ভে খুবই কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন কিন্তু শেষ-জীবনের লেখায় তিনি প্রচলিত ইডিয়ামকে খুব কাজে লাগিয়েছেন, যার ফলে তাঁর লেখার ভাষা মুখে-বলা কথার খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রযুগে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীই নতুন এক গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ইংরেজি পাঠশালার ছাত্র ; প্রমথবাবু ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র হয়েও কার্যত ছিলেন ফরাসি সাহিত্যের অনুরাগী। যত্ন করে ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন। গদ্যরচনায় ভলটেয়ার-এর ভাষা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—'লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত, সাফ'। প্রমথবাবুর নিজের ভাষা সম্বন্ধেও এই কটি কথা প্রযোজ্য। কোথাও ঢিলেঢালা কিছু নেই, যেমন আঁটসাঁট দেহের বাঁধুনি, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখশ্রী। অত্যন্ত যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী মানুষ ছিলেন, সেজন্যে গদ্যে পদ্যে কোথাও ভাবালুতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী মননধর্মী মানুষ কিন্তু তাঁদের ভাষায় আবশ্যক মতো একটু আর্দ্রতা আছে, তাতে জিনিসটা জলো-জলো হয়নি, বরং স্বাদ একটু বেড়েছে। প্রমথবাবুর ভাষায় বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই, তাতে প্রবন্ধ-জাতীয় জিনিসের কোন ক্ষতি হয়নি। ভাষার প্রখরতা, যুক্তির প্রাবল্য বুদ্ধিমান পাঠকের মনকে উদীপ্ত করেছেন। আর্দ্রতার অভাব পূরণ করেছে witএর প্রাচুর্য, সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। কিন্তু গল্পে-উপন্যাসে যেখানে রস নিয়ে কারবার সেখানেও রসের লোলুপতায় তিনি প্রলুব্ধ হননি। কথার কারুকলা এবং witএর উপরেই নির্ভর করেছেন। কিন্তু রসের ব্যাপারে এক-আধটু আর্দ্রতা না থাকলে চলে না—(রস কথাটি বড় সুন্দর, আর্দ্রতা ওর স্বভাবধর্ম।) এখন যতদিন যাচ্ছে আর্দ্রতার অভাবে তাঁর যে-সব গল্প একদিন পাঠক-সমাজকে চমকিত করেছিল, সে-সব গল্প ক্রমে যেন brittle হয়ে যাচ্ছে, আয়ু কমছে। তবে প্রবন্ধের বেলায় সে ভয় নেই। মননশীল পাঠক এবং লেখকদের কছে ঐ গদ্যরীতির আবেদন বাড়বে বই কমবে না।

ভাষার দিক থেকে শরৎচন্দ্র মোটামুটি রবীন্দ্রপন্থী। সে যুগে তিনিই সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। বাঙালি হৃদয়কে তিনি যেভাবে স্পর্শ করেছিলেন তেমন আর কেউ নয়। প্রতিটি গল্পে অনেখানি আবেগের সঞ্চার করেছেন এবং সেজন্য ভাষার মধ্যে একটু অধিক পরিমাণে লবণাম্বু মেশাতে হয়েছে। তার ফলে ভাষা শুধু আর্দ্র নয়, একটু বেশি জলোজলো হয়েছে। ইদানীং ভাষার অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে; এরূপ চলতে থাকলে আগামী দিনের পাঠকদের কাছে শরৎবাবুর ভাষা একটু অতিমাত্রায় তরল ঠেকতে পারে। বলা বাহুল্য এ ভাষার প্রধান গুণ—অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ গতি, কোথাও আটকায় না। আজকের পাঠক বোধকরি একটু দুর্গম পথে চলতে ভালোবাসে, হোঁচট খেতে খেতে চলতে পারলে একটু উদ্দীপনা বোধ করে। তাদের মতে পড়াটাও একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

কল্লোল যুগের লেখকদেরও এক-আধটু মুদ্রাদোষ ছিল। সামান্য কথাকেও তাঁরা বড় বেশি ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখতেন। কম কথায় যত বেশি প্রকাশ করা যায় তাতেই ভাষার কৃতিত্ব। ভাষা স্বভাবধর্মেই মুখর ; মুখর ভাষাকে তুখোড় করে নিতে হয়। কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে ছিলেন জাত-লিখিয়ে। তাঁরা ফেনানো ভাষার দুর্বলতা অল্পদিনেই কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং পরে স্ব-মহিমায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ভাষার উপরে সকলেরই দখল ছিল, সকলেই প্রশংসনীয় গদ্য লিখেছেন, কিন্তু কারো ভাষাতেই নিজস্ব ব্যক্তিত্বের এমন ছাপ পড়েনি যে আলাদা করে প্রত্যেককে চেনা যায়। ইংরেজিতে কথা আছে—Style is the man—লেখকের ব্যক্তিত্বই স্টাইল হয়ে দেখা দেয়। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী,

অবনীন্দ্রনাথ—তাঁদের লেখায় নিজস্বতা এমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত যে দুটি ছত্র পড়লেই প্রত্যেককে আলাদা করে চেনা যায়। বর্তমান লেখকদের মধ্যে ভাষাশিল্পী হিসাবে অন্নদাশংকর রায়ের নাম করা যেতে পারে। তাঁর গদ্যে একটি বিশেষ ছাঁদ এবং স্বাদ আছে।

অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষদের কথাবার্তায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কল্লোলযুগের লেখকরাই প্রথম করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করলেই গল্পটা অধিকতর বাস্তব হয়ে ওঠে এমন আমি মনে করি না। জীবনের সত্য ভাষার উপরে নির্ভরশীল নয়। মানুষটা কী ভেবে কী করছে—তার ভাবনাচিন্তা কার্যকলাপ যদি সম্ভাব্যতাকে লঙ্ঘন না করে তাহলেই জিনিসটা বাস্তব হবে। তারই মধ্যে মানুষটা যদি হঠাৎ তার স্বভাবগত ভঙ্গিতে নিত্যদিনের ভাষায় কথা কয়ে ওঠে তাহলে মুহূর্তে মানুষটা তো বটেই, সমস্ত পারিপার্শ্বিকটাই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করবাবু গল্পের মূলধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে গ্রাম্যভাষার ব্যবহারটি খুব কায়দার সঙ্গে করেছেন। বাঙলা গদ্যে কথ্যভাষা প্রচলনের কৃতিত্ব যেমন প্রধানত প্রমথবাবুর, আঞ্চলিক ভাষাব্যবহারের কৃতিত্ব তেমনি শৈলজানন্দ এবং তারাশঙ্করের। এ বিষয়ে অবশ্য সব চাইতে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলতে গেলে একটি গোটা বই তিনি পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লাদের ভাষায় লিখেছেন এবং সে ভাষার মাধ্যমে রসসৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে সাহিত্যিক অর্থাৎ পোশাকি ভাষা ব্যবহার করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। যেখানে যেভাবে বললে রসটুকু পুরোপুরি প্রকাশ পায় সেটিই সে রসের প্রকৃত ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করলেই জিনিসটা অধিকতর রসালো হবে এমনও নয়। আমি আগে যে ইডিয়ামের কথা বলেছি ভাষার প্রাণশক্তি সেই ইডিয়ামের মধ্যে নিহিত। সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ কথাবার্তায় সারাক্ষণ সে ইডিয়াম ব্যবহার করে। সে-সব শব্দ বা কথার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে তার আভিধানিক প্রতিশব্দগুলি অতিশয় নির্জীব। কাজেই গ্রাম্য বা অমার্জিত বলে সে-সব কথাকে জাতে ঠেললে চলবে না। তাদের জলচল করে নিতে হবে। ইংরেজিতে 'slang'-এর অভিধান রচিত হয়েছে। এককালে নিন্দিত কিন্তু ইডিয়াম-সম্মত বহু অমার্জিত শব্দকে এখন সাহিত্যের আসরে সাদরে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ইংরেজি ভাষা শব্দভাণ্ডারে এবং রসসম্ভারে দু দিকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আইরিশ নাট্যকার সিনজে (Synge) তাঁর এক বন্ধুগৃহে আতিথ্য-যাপনকালে অলক্ষিতে বসে বসে উক্তগৃহের ঝি-চাকরদের বিশ্রম্ভালাপ শুনেছিলেন, শুনে তিনি চমৎকৃত। মনে হয়েছিল তাঁর আপন সমাজে এবং কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ভাষা শিখেছেন, সে ভাষা এর তুলনায় কিছুই নয়। এদের ভাষা অনেক বেশি তুখোড়, অনেক বেশি ভাবব্যঞ্জক। ভাষা শিখতে হলে এদের কাছেই শেখা প্রয়োজন। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষায় নাটক লিখে সিনজে, ও'কেসি (O'Casey) প্রভৃতি লেখকরা আইরিশ নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন।

এখন যাঁরা আমাদের নব্য লেখক, যাঁরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন তাঁরা সকলেই বাঙলা ইডিয়াম সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং সম্ভবমতো তার সদ্‌ব্যবহারও

করছেন। এঁরা সকলেই মোটামুটি ভালো গদ্য লিখছেন, যদিচ অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যরচয়িতা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় এমন লেখক এখনও পাচ্ছি না।

বাঙলা গদ্য সম্বন্ধে সব চাইতে বড় যে ভয় ছিল—অতিরিক্ত আবেগময়তা, জলো-জলো ভাব, সেটা বাঙলা গদ্য মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছে। তাহলেও একটি বিষয়ে আমার মনে একটু অস্বস্তিবোধ আছে। আমাদের অনেক নব্য সাহিত্যিক এখন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। তাতে সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি হবে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিছু সুফল অবশ্যই হয়েছে কিন্তু অস্বস্তির কারণ এই কারণে ঘটছে যে সাংবাদিকরা অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন যে জার্নেলিজম একটি সায়েন্স। তাঁরা যে সংবাদ পরিবেশন করবেন তার প্রধান গুণ হবে precision। সংবাদটি সঠিক এবং বর্ণনা যথাযথ হবে অর্থাৎ ভাষাটি সংযত হবে ; ঢিলেঢালা কিছু চলবে না। কিন্তু বোধকরি জনপ্রিয়তার খাতিরে তাঁরা অনেক সময় সংবাদ পরিবেশন করেন রম্যরচনার ধাঁচে। এটি হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এর ফলে সাংবাদিকতার স্ট্যান্ডার্ড নিচু হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের কাছে আমার এই বিনীত আবেদন যে, তাঁরা সাংবাদিকতার উপযোগী আবেগবিহীন সংযত সংহত সুসংবদ্ধ ভাষা তৈরি করে দিন। তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রম্যরচনা যেমন জার্নেলিজম নয়, জার্নেলিজমও তেমনি রম্যরচনা নয়। দুটির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

সংবাদপত্রের ভাষায় যে শিথিলতার কথা বলেছি তার মূলে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। এটা বিজ্ঞানের যুগ ; ভাষাকে এখন বিশেষভাবে বিজ্ঞানের মুখপত্র হতে হবে। আমাদের ভাষা জ্ঞানের-চর্চা যতখানি করেছে, বিজ্ঞানের চর্চা সে অনুপাতে কিছুই করেনি। সে এখনও বিজ্ঞানভাবাপন্ন হয়নি। বাঙলা গদ্য অনেক পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছে, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হবে। সিদ্ধিলাভের জন্যে সাধনা চাই। ভাষাকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। আমাদের ভাষা এখনও এমন নিখুঁত নিশ্ছিদ্র ঠাসবুনানি হয়নি যে, সমস্ত তত্ত্ব বা সত্য ভাষার জালে ধরা পড়বে। অনেক কিছু জালের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। ভাষার সেই ফাঁকগুলো বুজিয়ে নিতে হবে। তবেই সে সুশৃঙ্খল চিন্তার এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের উপযোগী বাহন হতে পারবে। ভাষাকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী হতে হবে ; দ্ব্যর্থবোধক কথা বললে চলবে না। এক কথায় ভাষাকে অনেক সুশৃঙ্খল, সুসংযত, সুসম্বদ্ধ, সত্যসন্ধ হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতায় বলেছিলেন—সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে আফ্রিকা বোধকরি ছিল প্রাচ্য ভূভাগেরই অন্তর্গত। পরে কখন আদিম সমুদ্রের কোন তোলপাড়ে সে গিয়ে ছিটকে পড়েছে দূরে। সেখানে নিবিড় অরণ্যে 'কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে' অবরুদ্ধ ছিল কত যুগ। প্রাচ্য প্রতীচ্য কারো সঙ্গেই তার যোগাযোগ হয়নি বহু শতাব্দী। এ কথা ঠিক যে ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পশ্চিমের চাইতে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গেই তার মিল বেশি এবং সেই সুবাদে সে আমাদের নিকট আত্মীয়। কিন্তু যোগাযোগ না থাকলে নিকট আত্মীয়ও অনাত্মীয় হয়ে যায়। ফলে মানুষের সংসারে আফ্রিকা ছিল একান্ত নিঃসঙ্গ। বহু যুগ কেটেছে অজ্ঞাতবাসে।

তারপর পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম ইয়ুরোপে যখন এল রেনেসাঁস এর আলোড়ন, দিকে দিকে মানুষ ছুটল অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে, গুপ্তধনের অন্বেষণে। মানুষের জয়যাত্রা বলে আমরা তাকে অভিনন্দন করেছি। অভিনন্দন নিঃসন্দেহে প্রাপ্য। কিন্তু একের প্রাপ্য অভিনন্দন অপরের পক্ষে কত বড় অভিসম্পাত হতে পারে নানান দেশের ইতিহাসে তার রক্তাক্ষর সাক্ষ্য আছে। জয়যাত্রার সঙ্গে এসেছে লোভীর দৃষ্টি, সবলের মুষ্টি—ভূমিজাত, বনজাত, খনিজাত সম্পদের যদৃচ্ছ লুণ্ঠন আর দুর্বলের নিপীড়ন। শুরু হল মানুষ নিয়ে ব্যবসা, মানুষ কেনা বেচা। বণিক বৃত্তি আর দস্যুবৃত্তি চলেছে পাশাপাশি। বণিকের মানদণ্ড দেশে দেশে রাজদণ্ডে পরিণত হল। রেনেসাঁস জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথকে যেমন উন্মুক্ত করেছে তেমনি আবার মানুষের নানা রিপুকে দিয়েছে প্রশ্রয়। রেনেসাঁস গর্বীরা সকলেই শাক্তপন্থী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিপুষ্ট পশ্চিম এই শাক্তধর্ম, সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের জন্মদাতা।

ভুক্তভোগী হয়েও আফ্রিকার দুঃখের কাহিনী আমরা তেমনভাবে জানবার চেষ্টা করিনি। তার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা ভাবতেও পারিনি। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজ্ঞান সহানুভূতি বুয়র যুদ্ধের সময়, এ শতাব্দীর গোড়ায়। পরে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়েছে গান্ধীজীর কল্যাণে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। শুধু প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিই নয়—আফ্রিকার সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের প্রতিই আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—তিরিশের দশকে—মুসোলিনির ইতালি যখন বর্বরোচিত বিক্রম দেখিয়ে বলতে গেলে নিরস্ত্র আবিসিনিয়াকে (বর্তমান ইথিওপিয়া) দলিত বিধ্বস্ত করেছিল তখন

আবার সারা প্রাচ্য মহাদেশেই দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য কোন শক্তিই সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেনি। লীগ অব নেশনস নামক তৎকালীন বিশ্ব সংস্থার দরবারে আবেদন করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। কারণ লীগ অব নেশনস শাক্ত-পন্থীদেরই আখড়া ছিল। ইতালির বিরুদ্ধে কিছু বিধি-নিষেধ জারী হয়েছিল বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। সমগ্র সভ্য জগৎ সমস্ত ব্যাপারটাকে দিব্য হজম করে নিল।

সমদুঃখী ছাড়া দুঃখীর বন্ধু নেই। যে সব দেশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে নিপীড়িত নির্যাতিত হচ্ছিল তারাই তখন বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয়েছিল—বিশেষ করে ভারত। ভারতীয় জনগণ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। আবিসিনিয়ার লাঞ্ছনা তাদের সঙ্কল্পকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আফ্রিকার অন্তর্বেদনা ভারতীয় কবির ভাষায় যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এমনটি ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোন ভাষায় হয়নি। আবিসিনিয়া লুণ্ঠনের (১৯৩৫-৩৬) পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর আফ্রিকা নামক বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটির রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হলেও কবিতার নিগূঢ় প্রেরণাটি যুদ্ধজাত নয়। সভ্যতার হাতে মানবতার যে অবমাননা ঘটছিল শতাধিক বৎসব ধরে—সে বেদনাই কবিকে অধিকতর বিচলিত করেছিল। সভ্যতার বর্বরতাকে উদ্দেশ করেই তিনি তাঁর ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই এখানে দেশব্যাপী যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সেটা বিশেষ ভাবে লক্ষ করছিলেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে—এ উত্তেজনাটা বর্ণভেদজনিত অর্থাৎ শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায়ের বিরোধ বলেই এতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ মুহূর্তে বর্ণভেদের প্রশ্নটা আদৌ জরুরী নয়। এর ফলে মূল সমস্যাটাকেই ছোট করে দেখা হচ্ছে। এমন কি যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিটাও মস্ত বড় কথা নয়। তার চাইতে ঢের বড় কথা হল—মানুষের অপমান। সেটা আফ্রিকায় যতখানি হয়েছে ততখানি পৃথিবীর আর কোথাও নয়। অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে—তার লাল রংটা চোখে পড়ে বলে সে সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারই সাংঘাতিকতা দুর্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্মান্তিক।'

প্রবলের প্রতাপ, দুর্বলের দলন—সুসভ্য রাজনীতির ন্যায্য নীতি বলে গ্রাহ্য। শক্তির অপব্যবহার মানুষের প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার দেখে দেখে কবির চিত্ত বিষাদগ্রস্ত। অবিচার অত্যাচার কবিকে যতখানি বিচলিত করে এমন আর কাউকে নয়। 'মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে।' জীবনের অন্ত্য পর্বে এই গ্লানিকর দৃশ্যই তাঁকে সবচেয়ে বেশি বেদনা দিয়েছে। তবে দেশে হোক—বিদেশে হোক, পৃথিবীর যেখানেই যখন কোন অন্যায় উৎপীড়ন ঘটেছে তখনই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। গান্ধীজী যে রবীন্দ্রনাথকে দ্য গ্রেট সেন্টিনেল আখ্যা দিয়েছিলেন—সভ্যতার সংকটকালে বারংবার তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। আবিসিনিয়া আক্রমণের সংবাদে যখন দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তখন মনে মনে গভীরভাবে বিচলিত হলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথমটায় নীরব ছিলেন।

কারণ বয়সের ভারে তখন তাঁর শরীর অশক্ত। বলেছিলেন—'পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আর কোন উত্তেজনায় এই ফাটল ধরা মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরব থাকতে পারেননি। এর একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটি বলছি।

১৯৩৬-এর মাঝামাঝিতে আবিসিনিয়া সম্পূর্ণরূপে ইতালির কবলীকৃত হল। সংখ্যায় অল্প হলেও বিবেকবান মানুষ সব দেশেই কিছু আছেন। সাম্রাজ্যগর্বী ইংলণ্ডেও কিছু ছিলেন। আবিসিনিয়ার ট্রাজেডি যখন সংঘটিত হয় তখন ফ্রেজার নামে আফ্রিকা-প্রেমিক একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ আফ্রিকা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন (মিঃ ফ্রেজার দীর্ঘকাল আফ্রিকায় বাস করেছেন। সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে আফ্রিকানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী ছিলেন)। আফ্রিকা সম্পর্কে তথাকথিত সভ্য মানুষদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজিতে ইচ্ছাকৃতভাবে যে-সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে তার নিরসনই ঐ বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল। ইয়ুরোপের ইতিহাসে ভিকটোরীয় যুগ এক মহা অশুভের জন্মদাতা—পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের জাল বিস্তার করে বসেছিল। ভিকটোরীয় যুগের ধার্মিকেরা কাব্য সাহিত্য বিজ্ঞান সহযোগে প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে আফ্রিকাবাসীরা মানুষ নয়—জন্তু বিশেষ। সে যুগের জ্ঞানী বিজ্ঞানী নৃতত্ত্ববিদরা সকলেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের খোঁটায় বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন—অনেক অসত্য আত্মগোপন করে থাকে স্কুলপিটের ঠিক পিছনটিতে—কলেজ ক্লাশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে—ক্রমে সেখানে থেকে ছড়াতে থাকে সারা দেশে—সে কথাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আফ্রিকায় যে মানবদেবতা আদিম যুগ থেকে স্ব-প্রকাশ—সেখানকার সমাজগঠন জীবনপ্রণালী সংস্কার বিশ্বাস ন্যায়নীতি বোধ ইত্যাদির আলোচনা করে মিঃ ফ্রেজার সেই মূল সত্যটি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

অমিয় চক্রবর্তী তখন অকসফোর্ডে। ফ্রেজারের বক্তৃতা শুনে তিনি অতিশয় অভিভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ সব বক্তৃতার কাটিং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কবিকে একটি অনুরোধও জানিয়েছিলেন—'আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আফ্রিকার এই Tribe Eternal (ফ্রেজারের বক্তৃতা-প্রসঙ্গ) নিয়ে আপনি যদি একটি কবিতা লেখেন। আফ্রিকা সম্পর্কে আপনার কোন কবিতা নেই। একটি কবিতা পেলে কী রকম আনন্দ হবে বলতে পারি না। পরে ইংরেজি হয়ে বেরোতে পারে।...কবিতা পাবার আশায় উৎসুক হয়ে রইলাম।' অমিয়বাবু চিঠিটি লিখেছেন ১৯৩৬-এর ৩১শে ডিসেম্বর। জাহাজী ডাকে চিঠি পৌঁছোতে তখন সময় লাগত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে চিঠি হস্তগত হবার পরে কবিতা রচনায় আর বিলম্ব হয়নি। কবিতাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ৮/৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭। আফ্রিকার ব্যাপারে মনে মনে অতিশয় বিচলিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। তখনকার চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে। তাহলেও বলতে হবে আফ্রিকা কবিতাটি একান্তভাবেই অমিয়বাবুর আগ্রহে এবং তাগিদেই লেখা। কাজেই কবিতাটির জন্যে আমরা পরোক্ষভাবে অমিয়বাবুর কাছেও ঋণী। অমিয়বাবুকে কবিতাটি পাঠিয়ে লিখেছেন—'আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি...আমার নিজ দেশী ভাষায় যে

রস আছে সেখানে পরদেশীর রসনা পৌঁছবে না। বাংলা ভাষার কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে ?'

কবিতাটি পেয়ে অমিয়বাবু উল্লসিত। লিখেছেন 'কবিতা পেয়ে আমরা কতদূর আনন্দিত হয়েছি বলতে পারব না। উগান্ডার চীফ—Prince Niyabongo এখন অকসফোর্ডে Queen's College-এ রিসার্চ করছেন। তিনি এই কবিতার ভাবার্থ শুনে অত্যন্ত বিচলিত এবং মুগ্ধ হলেন। আপনাকে তাঁর একটি বই পাঠাচ্ছেন এবং চিঠি লিখছেন।'

অমিয়বাবু প্রথম চিঠিতেই ইংরেজী তর্জমার অনুরোধও জানিয়ে রেখেছিলেন ; কিন্তু কবি রাজী হননি। নিজ কাব্যের ইংরেজী তর্জমায় তাঁর আর কোন আগ্রহ ছিল না। গীতাঞ্জলির ইংরেজীর অনুবাদ নিয়ে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের মনে পরে যে চিত্তবিকার দেখা দিয়েছিল, তাতে তিনি যেমন বিস্মিত তেমনি মনে মনে আহত বোধ করেছিলেন। বন্ধুজনের ক্ষুদ্রচিত্ততা মনকে তিক্ত করে দিয়েছিল। সে তিক্ততা এখানে কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন—'বাংলা কবিতাকে শিকলি বেঁধে পরের হাটে নিয়ে যেতে দুঃখ হয়। তা ছাড়া ধিক্কার বোধ করি খ্যাতির জন্যে হাত পাততে অনাত্মীয়ের দ্বারে।'

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কদিন না যেতেই কবিতাটির ইংরেজী তর্জমা তিনি করেছেন। তারও কারণ আছে। উগান্ডার প্রিন্স নিয়াবঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেই কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদের জন্যে কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনুবাদটি একান্ত ভাবে প্রিন্সের আগ্রহাতিশয্যেই করা। অনুবাদটি পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছেন 'I shall feel richly compensated if I know it will reach my friends in Africa and let them realize how an Indian poet feels about the despoliation of a whole continent in the name of civilization.' তবে অনুবাদের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ ছিল না। অমিয়বাবুকে লিখেছেন—'আফ্রিকার সেই কবিতা তর্জমা করে পাঠিয়েছি।...আমার বর্তমান সেক্রেটারি সাহেবের (অনিলকুমার চন্দ) প্রবর্তনায় অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটা স্পেকটেটরে পাঠিয়ে দিয়েছি।' তর্জমাটি পেয়ে অমিয়বাবু লিখেছেন 'ইংরেজি কবিতাটি পেলাম। এটা তর্জমা নয়, নূতন সৃষ্টি।... আমরা এখানে নানা যায়গায় এ নিয়ে আলোচনা করব ; আফ্রিকাতে যাতে দু চার যায়গায় পৌঁছায় দেখব।' পরে অপর এক চিঠিতে লিখেছেন—'ফ্রেজার আপনার আফ্রিকা কবিতা পড়ে কত দূর বিচলিত হয়েছেন বলা যায় না—তাকে পাঠিয়েছিলাম আপনার message সুদ্ধ, ঐ সময়ে এণ্ড্রুজ ছিলেন তাঁর সঙ্গে, সবাই মিলে আপনার কবিতা পড়েছেন ; ফ্রেজার এর Africa & Peace বক্তৃতা সূত্রেই এই কবিতা লিখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁর রচনা যে আপনার একটুও কাজে লেগেছে এতে উনি ধন্য হয়েছেন।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ফ্রেজার রবীন্দ্রনাথের মস্ত বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ভ্রমণে যান তখন ফ্রেজার সিংহলে ছিলেন। ফ্রেজার দম্পতির আমন্ত্রণে কবি তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রেজার অমিয়বাবুকে বলেছিলেন যে সেটি তাঁদের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

রাজ্যচ্যুত আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী তখন ইংলণ্ডে বাস করছিলেন। 'আফ্রিকা' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ তাঁর হাতেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অপর দিকে ইংলন্ডে ছেপে কবিতাটি বান্টু এবং সোহানি ভাষায় অনুবাদ করে আফ্রিকানদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন।

'আফ্রিকা' কবিতার এই ইতিহাস। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আজ আবার আফ্রিকায় সংকট দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সে কবিতার কথা আজ আবার মনে পড়েছে। তবে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আফ্রিকা যতখানি অসহায় ছিল আজ আর ততখানি অসহায় নয়। সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাঁটি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ায় আফ্রিকাবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত হানছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ছায়াবৃতা' সেই Dark continent আজ দিবালোকে প্রকাশিত। বহু শতাব্দীর ঘুমের ঘোর কাটিয়ে সে আজ জেগে উঠেছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধীনতা পাশ থেকে একটি একটি করে আফ্রিকার দেশ মুক্তি লাভ করছে। ভাবতে ভালো লাগে যে, এই জাগরণে রবীন্দ্রনাথের কিছু হাত আছে। তিনি প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। সভ্যতার বর্বরতাকে এমন জ্বলন্ত ভাষায় অপর কোন কবি ধিক্কার দিয়েছেন বলে আমি জানি না—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
   নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
   এলো মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
   সভ্যের বর্বর লোভ
      নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
   পঙ্কিল হ'ল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
      বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

ধিক্কারের ভাষা নিষ্ঠুরের মর্মে প্রবেশ করে না। যে মানুষ অতিমাত্রায় সেয়ানা সহজে তার চেতনা হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়স্টার এবং রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথ যুগের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তা বোঝেন বলে মনে হয় না। এঁরা এখনও উপনিবেশবাদী উনবিংশ শতকেই পড়ে আছেন। কালের সঙ্গে যে চলতে জানে না, তাকে কাল-গ্রাসে পড়তে হয়। এখন সেই অন্তিম কাল উপস্থিত, সে বোধ কি এঁদের আছে, ইংলন্ড আমেরিকার দৌত্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে চেষ্টা চলছে দুর্বুদ্ধির প্যাঁচে, এঁরা যদি তা বরবাদ করে দেন তাহলেও কেউ অবাক হবে না! সর্বনাশে সমুৎপন্নে এহেন পণ্ডিতেরা অর্ধেক তো দূরের কথা কণাটুকুও ছাড়তে চান না। যদি তাই হয় তবে তার ফল হবে বিষময়। এখন যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে অচিরে তাই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হতে পারে। সমগ্র সভ্য জগৎকেই এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে।*

রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতা কেবল তো আফ্রিকাকে উদ্দেশ করে নয়, সভ্যতাগর্বী পশ্চিম জগতকেও উদ্দেশ করে বলেছেন, কত শতাব্দী ধরে এখানে সভ্য মানুষ বর্বরের

মতো ব্যবহার করে আসছে। সেই পাপে আজ পশ্চিম দিগন্তে সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত, (কবিতাটি রচনার ঠিক আড়াই বছর পরে যুদ্ধ বেধেছিল)। প্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র সভ্য জগতের হয়ে কবি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন ঐ 'মান-হারা মানবীর দ্বারে।'

আজকের পাশ্চাত্য জগতকে দেখলে মনে হয় না এরা সুশিক্ষিত বা সুসভ্য। বিংশ শতাব্দীতে দু দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটুকু বুঝতে, খুব একটা জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না যে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরোধ বৃদ্ধি পায়, এমন কোন ব্যাপারকেই প্রশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়। একটি মাত্র অগ্নিকণা থেকে বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তা সত্ত্বেও আজ পৃথিবীময় যত বিদ্বেষ বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে তার সমস্তই পশ্চিমী শক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফল। এত দুর্ভোগের পরেও দুর্বুদ্ধি যায়নি। দেশে দেশে ভীষণ থেকে ভীষণতর অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। পারমাণবিক বোমা নিয়ে ঘর করা আর ঘরে কাল সাপ পোষা এক কথা। পৃথিবীর পরবর্তী সংঘর্ষে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার অনিবার্য। তখন কেউ রক্ষা পাবে না। পৃথিবীতে তখন শ্বেতাঙ্গ থাকবে না, কৃষ্ণাঙ্গও থাকবে না ; থাকবে শুধু বিকলাঙ্গ মানুষ।

শান্তিনিকেতনের বৈপ্লবিক ভূমিকা

বিপ্লবের একটা রণচণ্ডী মূর্তি আছে। কথাটা শুনলেই একটা প্রচণ্ড কলরবকারী, ধ্বজাবহনকারী, শস্ত্রধারী, মারমুখী জনতার কথা মনে হয়। আসলে এটা তার ক্ষণস্থায়ী একটা ক্ষিপ্ত মূর্তি, বলা যেতে পারে সে তখন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই। বিপ্লব যখন প্রকৃতিস্থ তখন সে শান্ত, কাজ করে নীরবে অলক্ষে। বিশ্বপ্রকৃতিতে যা ঘটে মানব প্রকৃতিতেও তাই। প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, ঘর-দোর ভাঙে, ঘরের চাল উড়িয়ে নেয়, গাছ ওপড়ায়, ডালপালা ভাঙে, প্রাণহানি ঘটে। লোকে ভাবে প্রচণ্ড একটা কিছু ঘটল। ওদিকে বসন্ত আসে, দখিন হাওয়া বয়, ফুলের রেণু ছড়ায়, নতুন সৃষ্টির বীজ বপন হয়। সবই নিঃশব্দে অলক্ষে, কেউ টেরই পায় না, ভেবেও দেখে না। জানে না এটিই আসলে বিপ্লব, নতুনের সূচনা। ঝড়টা বিপ্লব নয়, সোরগোল যতখানি করে, কাজ ততখানি নয়।

বিপ্লব কথাটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। এ শতাব্দীর গোঁড়াতেও বিপ্লব বলতে বোঝাত 'ফরাসী বিপ্লব'। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন রুশ বিপ্লব ঘটল তখন কথাটা আরেকটু বেশি চালু হল ; তাহলেও এ দুই বিপ্লবেরই মর্মকথা শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বিপ্লব পদার্থটা কি সাধারণ মানুষ তা জানতও না বুঝতও না। শিক্ষিত মহলেও বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণাটা এখনও বেশ একটু স্থূল বলতে হবে। গান্ধী চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে প্রচণ্ড তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছিলেন, জনসমুদ্রে এত বড় আলোড়ন এ দেশে আগে কখনো দেখা যায়নি। সমস্ত দেশের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল ; বদলেছে মানুষ চলনে বলনে, ভাবে-ভবিষ্যতে। মনে হত, এলেম নতুন দেশে। কিন্তু গান্ধীর আন্দোলন নিরস্ত্র এবং অহিংস ছিল বলে কেউ তাকে বিপ্লব আখ্যা দেয়নি। আপন অধিকার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা এবং সে অধিকার লাভে তাকে প্রয়াসী করে তোলা নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক কাজ। সে হিসাবে গান্ধীজীর বিপ্লবী ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আসল কথা বলপূর্বক শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত করাকেই শুধু আমরা বিপ্লব বলে জেনে রেখেছি, সেজন্যে বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে গিয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার দাবি করা ছাড়াও বিপ্লব হতে পারে। কোন প্রকার আন্দোলন ছাড়াই বহুকালের জীর্ণ পুরাতন জীবনধারার পরিবর্তন করে তাকে যদি যুগোপযোগী করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে তাকেও বিপ্লব বলে স্বীকার করে নিতে হবে। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতনের বিশেষ

একটি বিপ্লবী ভূমিকা আছে। আমাদের সমাজজীবনের রূপান্তরে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। সর্বদা সর্বত্র দেখে অভ্যস্ত হয়েছি বলে যেসব জিনিস আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলে মনে হয় আজ থেকে আশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর পরিকল্পিত নতুন সমাজগঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন তাঁকে বহুবিধ বাধা এবং বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু যথার্থ বিপ্লবী নেতার ন্যায় তিনি তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। একমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরপরে আর সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হননি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তায় পথ নির্দেশ করেছেন, দেশের অগ্রগতির কথা ভেবেছেন আজীবন এবং যখন অপর কোন নেতাই ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি তখন হাতে কলমে সমাজ সংগঠন এবং গ্রাম সংগঠনের কাজ করেছেন।

স্বদেশী যুগে তিনি যে স্বদেশী সমাজেব কথা বলেছিলেন সে সমাজগঠনে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন উৎসাহ দেখাননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নতুন সমাজ শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলেছিলেন। এই সমাজটির গঠন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে দেশবাসী ঠিক অবহিত নন, যদি হতেন তাহলে বোঝা কঠিন হত না যে, এই সমাজটির উদ্ভবই একটি বিপ্লব। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকেই বলে বিপ্লব। গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করে আসছিলাম রবীন্দ্রনাথের গড়া শান্তিনিকেতন সমাজটি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এই সমাজের গঠনপ্রণালী এবং ব্যবস্থাপনার কথা বললেই এর বৈপ্লবিক মূর্তিটি পাঠকবর্গের কাছে সুস্পষ্ট হবে।

পাঁচটি মাত্র বালক এবং চার জন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়ের শুরু। ছাত্র শিক্ষক সকলের এক সঙ্গে বাস এক সঙ্গে আহার। একটি পাচক ছাড়া অন্য কোন ভৃত্য ছিল না। গৃহস্থালির অন্যবিধ সব কাজ ছাত্র শিক্ষক হাতে হাত মিলিয়ে নিজেরাই করতেন। ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা, আহারের পরে নিজ নিজ থালা-বাসন ধুয়ে নেওয়া—সব কাজ ছাত্র-মাস্টাররা নিজেরাই করতেন। বিদেশী শিক্ষক এনড্রুজ পিয়ার্সন যখন এলেন, তখন তিনিও এ সব কাজ নিজ হাতে করতেন। কারো জন্যেই বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল সম্ভ্রান্তবংশীয় কয়েকটি বামুন কায়েত বদ্যি বালক নিয়ে। ছাত্রসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছেলেরা এল। তারপরে একটি দুটি মুসলমান বালক। সকলে একই বাসগৃহে থাকে, একই রান্নাঘরে খায়। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে এসব কথা কেউ ভাবতেও পারত না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গোড়ার দিকে কয়েক বছর রান্নাঘরে আলাদা কটি আসন ছিল, বলা হত ব্রাহ্মণ লাইন। বামুন ছেলেরা আলাদা বসতে চাইলে আলাদা বসবে। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে কোন উপদেশ দিতে যাননি, বক্তৃতা করেননি। তিনি কোন বিষয়েই কারো উপরে জোর খাটাতেন না। তিনি বলতেন, অল্পবয়স্কদের মন উদার, তারা ব্যবধান রক্ষা করে চলে না। একে অন্যের কাছেই আসতে চায়, দূরে থাকতে চায় না। সংস্কারবশে কিছুদিন আলাদা বসলেও একদিন তারা নিজেরাই সকলের মধ্যে চলে আসবে। হয়েছেও তাই। কয়েক বছর পরেই দেখা গেল ব্রাহ্মণ লাইনটি আর নেই।

রবীন্দ্রনাথ যদি গোড়াতেই বলে বসতেন এখানে জাতবিচার চলবে না, ছোঁয়াছুঁয়ির বাধা মানা হবে না, তাহলে প্রাচীনপন্থী সব পরিবার থেকে ছেলেপুলেদের এখানে পাঠানোই হত না। বিপ্লবের পথে সেটাই একটা অন্তরায় হত ; কারণ সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হলে রক্ষণশীলতার দুর্গেই ভাঙন ধরাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিক জায়গাতেই আঘাত হেনেছিলেন, কিন্তু কেউ তা টেরও পায়নি। মস্ত বড় একটা ব্যাপার বলতে গেলে অলক্ষেই ঘটেছে। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান, বামুন কায়েত, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা একসঙ্গে থেকেছে খেয়েছে। ধর্মের প্রশ্ন নেই, বড় ছোট, উচ্চ নীচের ভেদ নেই, সকলে সমপর্যায়ের—একে যদি বিপ্লব না বলি তবে বিপ্লব বলব কাকে ? আজকের দিনে দেখে দেখে অভ্যস্ত বলে এ সব জিনিস আমাদের কাছে খুব চমকপ্রদ মনে হয় না, কিন্তু প্রথম যখন ঘটেছে তখন এরূপ সামাজিক মিলনের কথা কেউ ভাবতেও পারেনি।

এরই সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও ঘটেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে— গুজরাট মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ থেকে অল্পবয়স্ক বালকরা এখানে পড়তে এসেছে। এরাও সেই এক সঙ্গে থেকেছে, খেয়েছে, খেলাধুলা করেছে, গান করেছে, নাটক করেছে— মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। আজ আমরা যাকে ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতি আখ্যা দিয়েছি—বিভিন্ন রাজ্যবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রয়াস—সেটি এখানেই সর্বপ্রথম হয়েছে। কারণ অবাঙালি ছাত্রদের আগমন শুরু হয়েছিল এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। আমাদের জাতীয় ঐক্য সাধনায় যে কটি প্রধান অন্তরায় আজও বিদ্যমান তার কোনটিই শান্তিনিকেতনে ছিল না। এখানে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না, উচ্চনীচ বর্ণভেদ ছিল না, বাঙালি অবাঙালির কলহ ছিল না। এই সমস্ত ভেদবুদ্ধি ছাড়িয়ে সমাজের সবচেয়ে বড় যে বিভেদ, ধনী দরিদ্রের বিভেদ সেটিরও সমাধানের একটা চেষ্টা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। সমাজে সম্পন্নে আর নিরন্নে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের গড়া অতি ক্ষুদ্র শান্তিনিকেতন রাষ্ট্রটিতে সে ব্যবধানটা চোখে পড়ত না। অধ্যাপক কর্মীদের বেতনের তারতম্য ছিল অতি সামান্য। আমাদের কলেজ অফিসের যে একমাত্র কেরানীটি ছিলেন তিনি বলতেন—জানেন, আমি এবং হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এক সময়ে একই মাইনে পেতাম—চল্লিশটি টাকা। ডক্টর দ্বিবেদী প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বা প্রোভাইস-চ্যান্সেলরের পদে কাজ করেছেন। চল্লিশের দশকেও উর্ধ্বতম বেতন ছিল আড়াইশ টাকা। পেতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসু। অধ্যাপকরা কার্যারম্ভ করতেন পঁচাত্তর টাকায়, অফিস কর্মীরা আরেকটু কমে। আমাদের মাইনে অল্পে অল্পে বেড়ে যখন দেড়শ'তে পৌঁছেছে, তখন বেশ মনে আছে, পূর্বোক্ত মহারথীদের কথা ভেবে আমরা একটু সংকুচিতই বোধ করতাম। মনে হত তাঁদের তুলনায় আমরা যে মাইনে পাচ্ছিলাম আমরা তার যোগ্য নই। যোগ্যতার তুলনায় অপরে আমার চাইতে বেশি পাচ্ছে এমন কথা কখনই মনে হত না। সকলের সমান অবস্থা, কাজেই কারো মনেই ক্ষোভ ছিল না, একে অন্যকে ঈর্ষা করবার কোন কারণ ঘটত না। এজন্য শান্তিনিকেতনে অসন্তোষ বা অশান্তি ছিল না। অভাব ছিল, অভিযোগ ছিল না। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অর্থাভাব ছিল বলেই উপকরণ বাহুল্যহীন একটি

অনাড়ম্বর সরল সহজ স্বচ্ছন্দ অথচ অতি সুন্দর জীবনধারার প্রবর্তন হয়েছিল। একদা সক্রেটিস এথেন্স নগরীর সুসজ্জিত বিপণিসমূহের পণ্যসম্ভার দেখে হেসে বলেছিলেন—আহা, এত এত জিনিসের ছড়াছড়ি, কিন্তু আমার তো এর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। শান্তিনিকেতনও তাই বলতে চেয়েছে। অপরে যাকে অত্যাবশ্যক মনে করেছে তেমন অনেক জিনিসকে বাদ দিয়েও জীবনকে কত সুন্দর করা যায় শান্তিনিকেতন মানুষকে তাই শিখিয়েছিল। দাবি-বিক্ষোভ-এর মধ্যেও একটি আভিজাত্য আছে। যে আভিজাত্য শান্তিনিকেতনে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। এ শিক্ষাকেও বৈপ্লবিক বলতে হবে। যা হোক এই যে স্বল্পায়তন একটি স্থানে আর্থিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস হয়েছিল, এ কি সামাজিক বিপ্লব নয়? সোরগোল করে ঘটেনি বলে এমন জিনিসটিও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

আজ কো-এডুকেশান সর্বত্র প্রচলিত। এরও আরম্ভ শান্তিনিকেতনে। অধ্যাপকদের মেয়েরা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে এক ক্লাশে বসে পড়েছে। তাদের দিয়ে শুরু, পরে বাইরে থেকেও মেয়েরা এসেছে। কোন অযৌক্তিক ব্যবধানকেই মানা হয়নি। সকলকে সমান চোখে দেখা হয়েছে, সকলের অধিকারকেই স্বীকার করা হয়েছে। এই সাম্যবাদী সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অধ্যাপক, অফিসকর্মী, অফিস পিয়ন এবং অন্যান্য সকল কর্মীই একই জীবনের অংশীদার ছিলেন। জীবনযাত্রায় খুব একটা পার্থক্য দেখা যেত না। অতি সাধারণ কাপড় জামা, সকলেরই খালি পা। জুতোর ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। নিত্যদিনের জীবনে পরস্পরের ব্যবহারে, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মানুষদের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান চোখে পড়ত না। কে অধ্যাপক, কে অফিস-কর্মী বুঝবার উপায় ছিল না। ছাত্ররা যেমন অধ্যাপক এবং কর্মীদের, তেমনি অফিসের পিয়নদের এবং রান্নাঘরের কর্মীদেরও দাদা বলে সম্বোধন করত। একজন নবীন অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে, কলেজ অফিসের কেরানীটি যে অধ্যাপক নন সেটি বুঝতে তাঁর পক্ষকাল কেটে গিয়েছিল। রান্নাঘরে খেতে যেতেন, ছাত্ররা এবং অন্যান্য অধ্যাপকরা রান্নাঘরের ম্যানেজারের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করতেন তাতে তিনি যে একজন অধ্যাপক নন, সে কথা বুঝতেও বেশ সময় লেগেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওই নবীন অধ্যাপকটি একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এখানে যে ক'বছর ছিলেন তাতে দলীয় রাজনীতি কখনো করেননি। বলতেন, আমরা যে ভবিষ্যৎ সমাজের কথা ভাবি তাব একটা কাঠামো এখানে তৈরি হয়ে আছে। একে ডিস্টার্ব না করাই ভাল। পরে ইনি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ভালো কাজ খুব ছোট করে হলেও কোথাও শুরু করতে হয়, পরে দেখাদেখি সেটি ক্রমে ছড়াতে থাকে। একটি প্রদীপ থেকে যেমন শত-সহস্র প্রদীপ জ্বালানো যায় এও তেমনি। দুঃখের বিষয় ছড়ায়নি বরং উল্টোটি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, আর শান্তিনিকেতন তার নিজস্বতা ছেড়ে দিয়ে অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, সরকার ছুঁলে তারও বাড়া। শান্তিনিকেতনের সেই শ্রেণীহীন সমাজটি ভেঙে কত রকমের শ্রেণী যে দেখা দিল। শিক্ষকদের মধ্যে ছিল একটি মাত্র শ্রেণী—এখন প্রফেসর, রীডার, লেকচারার,

অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার, ইন্সট্রাক্টর নামধেয় উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত ভোগী নানাবিধ শ্রেণী এবং অফিস কর্মীদের মধ্যে ক্লাস ফোর পর্যন্ত চতুর্বর্ণ বিভাগ দেখা দিল। একটি ব্যাপার লক্ষ করে তখন খুব অবাক হয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনে যখন এসব পরিবর্তন ঘটে, তখন অধ্যাপক কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু ছিলেন বামপন্থী রাজনৈতিক দলভুক্ত। তাঁদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়েছিল বলে শুনিনি। আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কারো সমর্থন লাভ করিনি। ফলও কিছু হয়নি। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যাঁরা পূর্বোক্ত সাম্যবাদী সমাজটি শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা কেউ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা রাজনীতি করেননি কিন্তু একটি নতুন সমাজ গড়বার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন সম্পর্কে একসময়ে লোকে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত ; বড়ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য এটি একটি শৌখিন প্রতিষ্ঠান। বড়ঘরের ছেলেমেয়ে কিছু অবশ্যই আসত কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ছিল সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেমেয়ে। কিছু থাকত একেবারে পাড়াগাঁয়ের চাষীপরিবারের ছেলে। এর সাক্ষ্য আমি নিজেই দিতে পারি। আমি প্রথম যেদিন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে আসি, সেদিনই ছাত্রদের আয়োজিত একটি বিতর্ক সভা বসেছিল। আমি উঠেছি গেস্ট হাউসে, তখনও কাজে যোগ দিইনি। বিকেলের দিকে একটি ছেলে ঐ সভায় যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে—আমি শিক্ষাভবন (তখনকার কলেজ বিভাগ) ছাত্র সম্মিলনীর সম্পাদক, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের অধ্যক্ষ মশায় আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ; আপনি এলে আমরা খুব খুশি হব। চমৎকার ছেলেটি—নম্র বিনয়ী, ভারি মিষ্টি স্বভাব। দু মিনিট আলাপের সূত্রে নিজেই বললে—আমি সাঁওতাল ছেলে, আমার নাম যাগু মাঝি।

সাঁওতাল ছেলে, চাষীর ছেলেকে যেমন গাছের তলায় লেপটিয়ে বসে ক্লাস করতে হয়েছে, আজকের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে, জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবীকে এবং অনুরূপ সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ ছেলেমেয়েদেরও তাই করতে হত। একই রান্নাঘরে একই সঙ্গে খাওয়া। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, কারো জন্যই আলাদা কোন ব্যবস্থা হত না। মানুষে মানুষে কোন ব্যবধানকেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। বিদ্যালয়ের শৈশব অবস্থাতেই তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, —গ্রাম্য অশিক্ষিত পরিবার থেকে যে সব ছেলে আসছে তাদের একটু ভদ্র মার্জিত, আর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে যারা আসছে তাদের একটু 'অভদ্র' করে দিতে হবে। এসব কথা রীতিমত বিপ্লবাত্মক। বলে রাখা প্রয়োজন যে শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসব কথা যখন তিনি বলেছেন, তখনও এদেশে বুর্জোয়া প্রলিটারিয়েট ইত্যাদি সাম্যবাদী বুলি চালু হয়নি। বললে ভুল হবে না যে, একটি মোটামুটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এদেশে শান্তিনিকেতনেই প্রথম হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনের এই যে সব বৈশিষ্ট্য, যাকে বৈপ্লবিক বলা চলে, খুব কম লোকেই তা ভেবে দেখেছেন। শুধু আজকের মানুষদেরই দোষ দিচ্ছি না। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে অজ্ঞতা আজ যতখানি—আগেও ততখানিই ছিল, বাইরে যতখানি ঘরেও ততখানি। রবীন্দ্রনাথের তা অজানা ছিল না। দুঃখ করে বলেছিলেন—'হায়রে দূরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কি সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা

আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়, যারা তরুণ তারা আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়। কেউ আমাদের আসন দেয় না।' এ ছাড়া ১৯২৯ সালে বিদেশ যাত্রার পথে জাহাজ থেকে একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন—'ওখানে (শান্তিনিকেতনে) যা বহুকাল থেকে আমি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি যা কোন চিহ্ন না রেখে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তারই কিছু কিছু অংশ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সমস্ত পৃথিবীতে আমার আসন করতে পেরেছি কিন্তু ওখানে এমন আসন তৈরি হল না যাতে আমাকে কুলোয়।' রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে বোঝেনি বলেই শান্তিনিকেতনে তাঁর আসন পাকা হতে পারেনি। আজ সে আসন লুপ্ত। শান্তিনিকেতন জীবন্মৃত। একদা শান্তিনিকেতন ছিল এক দুঃসাহসী অভিযানে ব্রতী। আজ কোথায় সেই দুঃসাহসী মন ? একান্ত বশংবদ তার মূর্তি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে ; সুবোধ বালক গোপালের ন্যায় যাহা পায় তাহাই খায়।

রবীন্দ্র স্তব

যুগে যুগে দেশে দেশে কত কত মহামানব—বুদ্ধ খ্রীস্ট চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষরা এলেন গেলেন, কিন্তু পৃথিবী আজও যে তিমিরে সে তিমিরে। প্রত্যেকেই ব্যর্থ, আবার যিনি যত বড়, তাঁর ব্যর্থতাও তত বড়। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে মহাপুরুষদের মহত্ত্ব বা বিরাটত্ব যাচাই করতে হয়, কে কতখানি ব্যর্থ হয়েছেন তাই দিয়ে। বুদ্ধ খ্রীস্ট চৈতন্য—প্রত্যেকেই প্রেম ধর্মের প্রচারক। বলেছিলেন, সকলকে ভালোবাসবে, একে অন্যকে হিংসা করবে না। কিন্তু আজকে পৃথিবীময় যে হিংসার তাণ্ডব চলছে এমনটি পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে? যুদ্ধ বিগ্রহ অবশ্যই হয়েছে, তবে যুদ্ধ যতই বিধ্বংসী হোক, সেটা একটা সাময়িক বিকার। কিন্তু আজকে শহরে, বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে, পথেঘাটে নিত্যদিন যে হিংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটে চলেছে, তা যুদ্ধের চাইতেও ভয়ঙ্কর, কেননা এই যে অবিরাম হত্যালীলা অবলীলায় ঘটছে, মনে হয় এ যেন মানুষের way of life বা জীবনযাত্রার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। দু চার শতাব্দী এ ভাবে চললে মানুষ একদিন হিংস্র জন্তুতে পরিণত হবে।

মহাপুরুষরা ভাবেন এক, হয় আর এক। তার কারণ তাঁরা যে পথ দেখান, যা বলেন মানুষের মনে মজ্জায় তা লাগে না। যে জিনিস তাঁরা পেয়েছেন মনের গভীরে সাধনার বলে, মানুষ তাকে ব্যবহার করে লোক-দেখানো প্রসাধনের প্রলেপ হিসাবে। সেটা মন থেকে দু দিনেই বেমালুম মুছে যায়। ফলে হয়েছে কি, আপাতদৃষ্টিতে মহাপুরুষদের শিষ্য প্রশিষ্য, অনুরাগী অনুগামী সংখ্যায় অগণিত কিন্তু কার্যত দেখা যায় ভক্ত যদি জোটে একটি, ভণ্ড জোটে নিরানব্বইটি। ব্যর্থতার মূল কারণ এখানেই। সংখ্যায় যে বড় তারই জয় সুনিশ্চিত। কাজেই অধর্মের জয় এবং ধর্মের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মহাপুরুষ বলতে আমরা সাধারণত ধর্মপ্রবর্তকদের কথাই ভাবি। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থে যদি নিই তাহলে মহামনস্বী এবং মহিমময় চরিত্রের অধিকারী এমন অনেকে আছেন যাঁদের মহাপুরুষ আখ্যা দিতে কোনই বাধা নেই। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য স্বভাব এমন যে মহামহিমদের গায়ে একটু ধর্মের ছোপ লাগাতে না পারলে আমাদের ঠিক মন ওঠে না। তাতে লাভ হয় না, ক্ষতিই হয়। ধর্মগুরুর আসনে বসিয়ে মানুষটিকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। তিনি আর নাগালের মধ্যে থাকেন না, আমাদের নিত্যদিনের কাজে লাগেন না। গান্ধী নিঃসন্দেহে মহামানব কিন্তু ধর্মগুরু নন। তিনি রাজনৈতিক নেতা, দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নায়ক। কিন্তু ঐ যে অবিরাম অহিংসার বাণী প্রচার

করেছেন তাতেই মহাত্মা আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক নেতাকে বলতে গেলে ধর্মীয় নেতায় পরিণত করা হয়েছে। মহাত্মার মাহাত্ম্য তাঁর রাজনীতিতে নয়, দেশ সেবায় নয়, জীবনভর সংগ্রামে নয়—মাহাত্ম্য পরম ধর্ম অহিংসায়। দেখা যাচ্ছে আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বা মহামানব আখ্যা দিই তাঁরা কেউ সেকুলার নন, প্রত্যেকেই প্রকারান্তরে একজন মঠাধ্যক্ষ মহান্ত। সবরমতী এবং ওয়ার্ধায় আশ্রম স্থাপন করার দরুন মহাত্মার ধর্মীয় মাহাত্ম্য আরোই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লাভ কি কিছু হয়েছে? আজ দেশময় হিংসার যে তাণ্ডব চলছে তাতে বিশ্বাস করা কঠিন যে, মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গান্ধী এ দেশে আমাদের সঙ্গে আমাদের মধ্যেই বাস করেছেন। ব্যর্থতা আর কাকে বলে?

এই যুগের অপর এক মহামানব রবীন্দ্রনাথেরও সেই দশা। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথকেও গুরুপদে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে। তা বলে খুব অবাক লাগে যে কবি মহাকবিদেরও আমরা মুনি ঋষি বানিয়ে ছেড়েছি। মনে হয় কবি আখ্যাটাকে আমরা যথেষ্ট সম্মানসূচক বলে মনে করি না। পশ্চিম দেশেও মহাকবির জন্ম হয়েছে, কিন্তু হোমার ভার্জিল দান্তে শেক্সপীয়ার গ্যোটে কেউ মুনি ঋষি রূপে পরিচিত নন। কিন্তু আমাদের দুই মহাকবি বাল্মীকি এবং বেদব্যাস—দুজনেই সর্বদর্শী মহাঋষি। লিখেছেন কাব্যগ্রন্থ, আমরা বলি ধর্মগ্রন্থ।

ওই দুই মহাকবির পরে আমরা আরো দুই মহাকবিকে পেয়েছি—কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ। খুব ভাগ্যের কথা যে কবি কালিদাসকে মুনি বা ঋষি বানাবার কোন চেষ্টা হয়নি। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় তিনি নবরত্নের এক রত্ন। অপর আট রত্ন থেকে তাঁকে পৃথক করে দেখা হয়নি। তাঁর অসাধারণ গুণগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্যান্য গুণীদের ন্যায় তাঁকেও সমাজের একটি রত্ন হিসাবে যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে বাড়াবাড়ি কিছু নেই। অযথা দৈবী মহিমা কিংবা দেবত্ব আরোপ করে মানুষটাকে 'অমানুষ' বানাবার চেষ্টা হয়নি। দেখা যাচ্ছে আদি যুগের তুলনায় কালিদাসের যুগে ভারতীয়দের রসবোধের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধে কালিদাসের কালের গুণকীর্তন করেছেন? কালিদাসের কালে জন্ম নিলে জীবন কত উপভোগ্য হত তাই ভেবে পুলকিত বোধ করেছেন। রসিক জনের সভায় বসে কোথায় হবেন দশম রত্ন, না এ যুগের অরসিকের সভায় এসে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে গুরুদেব সেজে বসতে হল। সে যুগের সঙ্গে এ যুগের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'সময় যেন ক্রমেই ইতর হইয়া আসিতেছে'—কথাটা কি খুব মিথ্যা বলেছেন? তিনি যে একজন কবি, সে কথাকে আমল না দিয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করা হল। এমনি আমাদের রসবোধ যে কবিগুরুকে আমরা একেবারে গুরুকুলের গুরুমশায় বানিয়ে ছাড়লাম। রবীন্দ্রনাথেরও দোষ আছে। বলেছেন বটে—আমি গুরু নই, আমাকে তোমরা গুরু বানিয়ো না। কিন্তু আপত্তিটা খুব জোর গলায় করেননি। ভক্তরা ভেবেছেন, ওটা নিতান্তই বিনয় বচন, কাজেই গুরুর কথায় কোন গুরুত্ব দেননি। তাও 'গুরুদেব' আখ্যাটা যদি কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনেই আবদ্ধ থাকত, তাহলেও না হয় ব্যাপারটাকে একটা ঘরোয়া ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু নোবেল প্রাইজের পরে দেশে একটি রবীন্দ্রানুরাগী সম্প্রদায় গড়ে উঠল। রবীন্দ্রচর্চার অঙ্গ হিসাবে গুরুদেব আখ্যাটিরও চর্চা শুরু হল। বোঝা কঠিন নয় যে গুরুদেব সম্বোধনটিকে একটি বিশেষ ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবেই

তাঁরা ব্যবহার করতেন। ইহুদীরা এককালে নিজেদের chosen people of God বা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট জাতি বলে পরিচয় দিত। সেটা যেমন ছিল একটা ধর্মীয় এবং জাত্যভিমানী স্নবারি, তেমনি সেদিনের রবীন্দ্রভক্তদের chosen people of Rabindranath হিসাবে পরিচয় দেবার প্রয়াসটিকেও একটি কালচারেল স্নবারি বলে মনে হত।

পরবর্তীকালে গান্ধী নেহরুর দৌলতে গুরুদেব আখ্যাটি সর্বভারতে প্রচারিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতি কিছু নেই, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে মানুষটা ঠিক অক্ষত নেই। যিনি ছিলেন মহাকবি, দেশবাসীর চোখে তিনি হলেন একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি—মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ। সোজা কথায় জগদ্গুরু শংকরাচার্যের ন্যায় জগদ্গুরু রবীন্দ্রনাথ। সম্মান অবশ্যই দেখানো হয় কিন্তু রসজ্ঞ মানুষের aesthetic sense-কে নিঃসন্দেহে পীড়িত করে।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন পূর্বোক্ত রবীন্দ্রভক্তদের খুব সক্রিয় দেখেছি। সবে বিশ্বভারতীব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠল। উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত করা। অনেকেই প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে যোগদান করেছিলেন। সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী এবং বিশ্বভারতীর পরিকল্পিত আদর্শে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাটের কোঠায়, কিন্তু উৎসাহ উদ্যম তাঁরও কিছু কম নয়। ঘন ঘন কলকাতায় আসছেন। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কখনো গানের আসর বসাচ্ছেন, কখনো অভিনয়ের আয়োজন করছেন। টিকিট কেটে সে গান শুনেছি, অভিনয় দেখেছি। সভা-সমিতিতে যখন বক্তৃতা করতেন তাতেও হাজির থেকেছি। কিন্তু এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ করা যেত। যেখানেই যেতাম—গানের আসরে হোক, প্রেক্ষাগৃহেই হোক কিংবা বক্তৃতা মঞ্চেই হোক—দেখা যেত একটি ভক্তের দল সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে আছেন। তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হত, রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁদের বিশেষ একটি অধিকার আছে, যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই সম্পত্তি। আমরা প্রাকৃতজনরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। আমাদের ন্যায় নগণ্যদের উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বটে--'আমি তোমাদেরই লোক' কিন্তু তাঁর ভক্তদের চোখে মুখে স্পষ্টতই ফুটে উঠত—না হে, উনি শুধু আমাদেরই লোক। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেদিন এঁদের খুব সুনজরে দেখিনি। মনের অসন্তোষটা এঁদের ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পড়ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপর। ভাবতাম, রবীন্দ্রনাথ আর কিছু করুন বা না করুন, বেশ কিছু স্নব তৈরি করেছেন। আমি একলা নয়, আরো অনেকেই অনুরূপ ভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের উপর দোষারোপ করেছি এই কারণে যে তিনি কি বুঝতে পারেননি, সেদিনের বঙ্গীয় সমাজে রবীন্দ্র সান্নিধ্য এক স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ? মনে হত, তিনি জেনে শুনেই একটি স্নবারিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

স্নবারি সম্পর্কে খানিকটা উষ্মা মনে জমে ছিল। মনে পড়ছে, এক সময়ে 'স্নব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বিদ্রূপ করে বলেছিলাম, বিংশ শতাব্দীর রাজসভায় এঁ জীবটি হল দশম রত্ন, নাম পররুচি। পরের অনুগামী, অনুসারী, অনুকরণকারী। বয়সের চাপে নানা বিষয়েই আমার মতামতের উগ্রতা কমে এসেছে। ভেবে দেখেছি,

অল্প বিস্তর স্নবারি সকল মানুষের মধ্যেই আছে। আমি নিজেও একটি স্নব, আর অনুকরণের কথাই যদি বলেন, ভালো জিনিসের অনুকরণটা কি খারাপ কাজ ? অবশ্য এ কথা ঠিক যে, নিজস্ব সম্বল কিছু না থাকলে পরানুকরণ পরস্বাপহরণে পরিণত হয়। সেটা ঠিক মনে মজ্জায় লাগে না, টেকসই হয় না। তবে যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না। পরবর্তীকালে এঁদের কারো কারো সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তি—আচারে ব্যবহারে সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এঁরা রুচিবান মানুষ। যেখানেই নতুন কিছু, সুন্দর কিছু দেখেছেন তাকেই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি সহজ শোভন রুচিবোধ জাগিয়ে দিয়ে বাঙালি জীবনকে যে একটি সুষমা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, পূর্বোক্ত 'স্নব' সম্প্রদায়ই ঐ রুচিবোধটি বাঙালি শিক্ষিত সমাজে সম্প্রসারিত করেছিলেন। স্বীকার করতে বাধা নেই যে পরোক্ষভাবে হলেও এঁরা একটা মস্ত বড় কাজে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন। বাঙালি জীবনের সেই সুষমাটি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যেখানেই যেতেন, প্রচুর লোক সমাগম হত ; কিন্তু জিন্দাবাদ ধ্বনি ছিল না। লোকের চোখে মুখেই একটি সশ্রদ্ধ সমীহ ভাব থাকত, তাতেই জয়ধ্বনি প্রকাশ পেত। মাইকের ব্যবহার তখনো শুরু হয়নি, সভায় প্রতিটি কথা লোকে নিঃশব্দে শুনত। তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে কিছু বললেও করতালি হত না। সেদিনের ছেলেমেয়েদের আচারে ব্যবহারেও একটা শোভন রুচির ছাপ ছিল। আজকের বাঙালি জীবনে রুচির বড় অভাব। নামে রুচির চাইতেও আচার ব্যবহারে রুচি ঢের বড় কথা। সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিবোধ রবীন্দ্রনাথের মস্ত বড় দান। আমি একেই বলেছি জীবনের সুষমা। পূর্বোক্ত ভক্তবৃন্দ ঐ সুষমাটির মর্ম বুঝেছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে খানিকটা মার্জিত রুচিবোধ বাঙালি শিক্ষিত সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল। এর কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য।

তাহলেও বলব, লাভ যেটুকু হয়েছে, সে তুলনায় ক্ষতিও কিছু কম হয়নি। 'গুরুদেব' আখ্যার বেলায় যেমন ক্ষীণ আপত্তি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ সেটিকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন, এই ভক্ত সম্প্রদায়টি সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ করেননি যে, একটি অতি ক্ষুদ্র উচ্চশিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ গণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। এর ফলে যথেষ্ট অনিষ্ট হয়েছে। দেশের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছিল। অশিক্ষিত জনসাধারণের তো কথাই ওঠে না, শিক্ষিত সমাজেও মস্ত বড় একটা অংশের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা প্রশস্ত ছিল না। অথচ এঁরাই সেই বৃহত্তর পাঠক সমাজ, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যায় তাঁর রসজ্ঞ এবং মর্মজ্ঞ ভক্তদের বাস। সেই মর্মজ্ঞরাও সেদিন একটু মর্মাহত বোধ করেছেন।

অথচ এই রবীন্দ্রনাথই জমিদারি পরিচালনাকালে দরিদ্রতম প্রজাটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। নিবন্ন মানুষের প্রাণধারণের আপ্রাণ সংগ্রাম তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। সাধ্যমত তাদের সুখ দুঃখের শরিক হতে চেয়েছেন। ওই সব অসহায় চাষীদের কথা ভেবেই পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের পল্লী সংগঠন কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছেন। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তেমন করে আর গড়ে ওঠেনি, যেমনটা হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে

শিলাইদহে, পতিসরে। ইচ্ছে থাকলেও সময়ে এবং শরীরে কুলোয়নি। তবে একথা বলতেই হবে যে এদের কথা একটি দিনের জন্যও ভোলেননি, নিরন্তর ভেবেছেন, বলেছেন, করেছেন। কিন্তু বিশ্বখ্যাতি লাভ করার দরুন তাঁর সময়ের উপরে তখন শত রকমের দাবি। নিজ মনোমত কাজ করবার সময় বা সামর্থ্য ছিল না ; কিন্তু কাজের প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনিই, কাজের নির্দেশনাও তাঁরই। সবই চলেছিল তাঁর উৎসাহে। কর্মীদের যতখানি উৎসাহ, রবীন্দ্রনাথের ততখানি। মনে খুব একটা তৃপ্তির ভাব। বলেছিলেন, জীবনের মস্ত বড় একটা অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। পল্লীসংগঠনের কাজে চেয়েছিলাম একজন সত্যিকারের দরদী; নিরলস, নিষ্ঠাবান কর্মী—এমন মানুষ যিনি কাজ ভালোবাসবেন, যাদের নিয়ে কাজ করবেন তাদের ভালোবাসবেন, আর সব চাইতে বড় কথা, যাদের জন্য কাজ করবেন সেই নিঃসহায় মানুষগুলোকে ভালোবাসবেন। এলমহার্স্ট আমার সে অভিলাষটি পূর্ণ করেছেন।

কিন্তু যাদের জন্য এত ভেবেছেন করেছেন তারা কি তাঁকে জানে ? অনেকে তো রবীন্দ্রনাথের নামই জানে না। বছর পঞ্চাশ আগেও বীরভূম জেলার লোককেই দেখেছি শান্তিনিকেতনের পথ দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করেছে, এসব বাড়িঘর কিসের, এখানে কি হয় ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের নাম বলতে মনে হয়নি নামটা তারা শুনেছে। ভাবলে খুব হাসি পাবে, আমরা যাঁকে বিশ্বকবি বলে প্রচার করে বেড়াই, দেশের শতকরা পঞ্চাশজন লোক তাঁর নামই শোনেনি। এদের বাদ দিয়ে আমাদের বিশ্ব। একেই বলে শিক্ষিতের স্নবারি। কোন কথা গভীরভাবে ভেবে দেখি না বলেই নানা রকম অসঙ্গত কথা আমরা বলে বেড়াই। ভাবলে বুঝতে পারতাম, যে-দেশে শতকরা সত্তর জন লোক নিরক্ষর সে দেশের কবি কী বিপুল পরিমাণে ব্যর্থ। কাজেই সে দেশের অতিবৃহৎ একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন তাঁর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে মেতে ওঠে তখন সেটাকে একটা দেশব্যাপী স্নবারি বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই স্নবারির শিকার হয়েছেন। ভক্তি যতখানি পেয়েছেন, সেবা ততখানি পাননি। রবীন্দ্রভক্তদের কথা আগেই বলেছি, তাঁদের গুণের কথাও বলেছি। তথাপি সত্যের খাতিরে তাঁদের স্নবই বলব। রবীন্দ্র সান্নিধ্যের প্রসাদ লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সংসারে লাভবান হয়েছেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের কৃচ্ছ্র-সাধ্য জীবনে কেউ এসে যোগদান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাজে হাত মিলিয়েছিলেন ? বলে নেওয়া ভালো যে পূর্বোক্ত বিশ্বভারতী সম্মিলনীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান কর্মকর্তা—প্রশান্ত মহলানবিশ, ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সকল কাজেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কথা বলছি না ; বলছি রবাহূত যাঁরা সম্মিলনীতে এসে যোগদান করেছিলেন তাঁদের কথা। ভজন-পূজনটা তাঁরা দূরে থেকেই করেছেন ; শান্তিনিকেতনের উৎসবাদিতে এসে যোগদান করেছেন, আমোদ আহ্লাদ করেছেন কিন্তু বিশ্বভারতীর কাজে প্রত্যক্ষভাবে কেউ যুক্ত হয়েছিলেন বলে আমি শুনিনি। প্রশান্তবাবুদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতী সম্মিলনীটি হবে বিশ্বভারতীর publicity wing বা প্রচার বিভাগ। সম্মিলনীর সভ্যরা সে কাজটা খানিকটা করেছেন, সেকথা অস্বীকার করব না। তবে তাঁরা আবার রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটাকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের glammer বাড়াবার উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।' এমন কথা সংসারে ক'জন মানুষ বলেন ? যাঁরা বলেন তাঁরা দিয়েই খুশি, প্রতিদানে কিছু পেলেন কি পেলেন না, সে হিসেব তাঁরা রাখেন না। রাখলে বুঝতে পারতেন তিনি কতখানি বঞ্চিত। শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়েছেন প্রচুর, কিন্তু তিনি শুধু তো কবি নন, তিনি কর্মী। মস্ত বড় কাজ ফেঁদে বসেছিলেন—বিদ্যালয়ের কাজ, বিশ্বভারতীর কাজ, গ্রাম সংগঠনের কাজ। এত যে ভক্ত, এত যে অনুরাগী—তাঁদের ক'জনকে পেয়েছিলেন কাজের বেলায় ? কবি মানুষ, কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না। সে জিনিস আছে অক্ষত। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান কটি গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে সহকর্মী সহযোগীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেখানে কি আশানুরূপ সাড়া পেয়েছিলেন ? প্রতিষ্ঠান কটির বর্তমান অবস্থা দেখলে মনে হবে না তারা অক্ষত আছে। কিছু নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাবান কর্মী অবশ্যই পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের গৌরবময় অধ্যায়টি তাঁদেরই নিঃস্বার্থ সেবার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ নিজেই মুক্তকণ্ঠে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন তাঁদের প্রতি যাঁরা সাগ্রহে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাছে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে। তবে এই যাঁদের কথা বলছি তাঁরা রবাহূত নন, তাঁরা এসেছিলেন আপন তাগিদে। সেজন্যই নিঃশেষে নিজেদের দিতে পেরেছিলেন। এঁদের ক'জন আবার চলে গিয়েছেন অকালে ইহলোক ছেড়ে। তাঁদের শূন্য স্থান আর পূরণ হয়নি। কারণ রবীন্দ্র সান্নিধ্যকামীদের মধ্যে সে দরের মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হত। কেননা একথা বোঝা খুব কঠিন ছিল না যে তাঁরা রবীন্দ্রসান্নিধ্যকে যতখানি মূল্য দিয়েছেন, শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে ততখানি দেননি। জীবনের অন্তিম পর্বে রোগশয্যায় শুয়ে কবির মনেও প্রশ্ন জেগেছিল—এত যে ভিড় জমেছিল, কোথায় গেল তারা সব ? বড় করুণ কণ্ঠে বলেছেন—

'বহুলোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে।'

এই যে নিঃস্ব প্রহরের কথা বলেছেন, এর চাইতেও নিঃস্বতর প্রহর আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে তো ইহলোক ছেড়েই চলে গেলেন, তার পরে আরো কত জন—কেউ কারণে, কেউ অকারণে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। ভাবলে অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন আর বছর কুড়ি যেতে না যেতেই সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। স্বভাবতই মনে হতে পারে যে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর প্রতি আনুগত্যটা খুব পাকাপোক্ত রকমের ছিল না। যাঁরা কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-বিহীন বিশ্বভারতী বোধকরি মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। অথচ ওই বিশ্বভারতীই রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। নিজ মুখে বলে গিয়েছিলেন—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহন করে চলেছে আমার এই বিশ্বভারতীর তরীটি।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পোশাকী ভাষায় যাকে বলেছিলেন 'জীবন দেবতা', জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, জীবনের শেষ বাক্যে তাকেই বলেছেন 'ছলনাময়ী'। ছলনা বঞ্চনার অভিজ্ঞতা জীবনে কিছু কম হয়নি। সংসারে যিনি যত বড হন, সংসা তত কঠিন হস্তে তার মূল্য আদায় করে নেয়। আমি যে স্নবারির কথা বলছিলাম, ঐ ছলনা বঞ্চনার সঙ্গে তারও একটা সম্পর্ক আছে।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ জীবনভর স্নবারির শিকার হয়েছেন। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। ইংরেজি গীতাঞ্জলির যুগে ইংরেজ কবি সাহিত্যিক মহলে কী প্রচণ্ড হৈ চৈ হল! কার চাইতে কে বেশি চড়া গলায় গুণকীর্তন করবেন তাই নিয়ে রেষারেষি। এমন কথাও বলা হয়েছিল—It seems, at length, we have a great poet in our midst—বহুকাল পরে মনে হচ্ছে আমরা এক মহাকবির সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু বৎসরকাল পরে যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন তখনই দেখা গেল ইংরেজের বন্দনা গান আর তেমন কলকণ্ঠ নয়। একমাত্র রোটেনস্টাইন ছাড়া অনেকেরই অভিনন্দন বার্তা বিলম্বিত, খুব স্বতঃস্ফূর্তও নয়। ইংরেজ সাহিত্যিক মহলে বোধকরি কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। সেটা ক্রমেই বেড়েছে যখন দেখা গেল সমগ্র ইয়ুরোপ জুড়েই রবীন্দ্রনাথের জয়জয়কার। এদিকে নোবেল প্রাইজের পরে ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলেন। বছর পাঁচেক অতিক্রান্ত হতে না হতেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ। এদেশে, ওদেশে সমগ্র ইংরেজ সমাজ বিষম উত্তেজিত। অ্যাঁ, রাজার দেওয়া উপাধি ত্যাগ! এ যে আমাদের রাজার অপমান। তখন আর ইংরেজ কবি সাহিত্যিকরা কবি সাহিত্যিক নন, তাঁরা শুধু রাজভক্ত প্রজা। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের চোখে আর কবি সাহিত্যিক নন, তিনি এখন এক রাজদ্রোহী প্রজা। ঈর্ষা এখন রোষে পরিণত হল। ওদেশে রবীন্দ্র বিদূষণের শুরু সেই থেকে।

১৯১২ সালে বিলেত থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখছেন—এখানকার কবি ইয়েটস আমার কবিতার কতকগুলি গদ্য তর্জমা কাল পড়লেন। খুব সুন্দর করে সুর করে তিনি পড়লেন। আমার নিজের ইংরেজির উপর আমার কিছুমাত্র ভরসা ছিল না—তিনি বললেন, 'যদি কেউ বলে এ গদ্যকে কেউ improve করতে পারে তাহলে সে সাহিত্যের কিছু জানে না।' খুব মজার কথা যে, কয়েক বৎসর পরে এই ইয়েটসই ম্যাকমিলানকে লিখছেন—রবীন্দ্রনাথ তো ইংরেজি জানতেন না, কাজেই গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিটি ছেঁটে কেটে সংশোধন করে তিনি তার খোল নলচে বদলে দিয়েছেন। ইয়েটসের উক্তি কতখানি সত্য তা নিরূপণ করা কিছুই কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথের মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ইংরেজি গীতাঞ্জলি মিলিয়ে দেখলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে। অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

ইয়েটস শুধু রবীন্দ্রনাথকে নাকচ করেই ক্ষান্ত হননি ; ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ সমস্ত ভারতবাসীকেই বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন Rabindranath does not know English, no Indian does. এ হচ্ছে বিলিতি স্নবারি। ভাষা জিনিসটা স্বভাবতই বশংবদ—একটু সাধ্যসাধনা করলেই সকলের কাছে ধরা দেয়। অ-বাঙালির লেখা অতিশয় সুলিখিত বাংলা গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কেউ বলেনি এঁর

বাংলাটা ঠিক বাঙালির বাংলা হয়নি। অ-বাঙালির বাংলা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ইংরেজ স্নবরা ভারতীয়দের ইংরেজি সম্বন্ধে বলে—ইন্ডিয়ান ইংলিশ। সাদা-কালা বর্ণবিদ্বেষের ন্যায় ভাষা-বিদ্বেষ এদের মজ্জাগত। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ বহু ভারতবাসী আছেন যাঁরা সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের চাইতে ভালো ছাড়া খারাপ ইংরেজি বলেন না বা লেখেন না। আজকের পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে যে, সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে ভাষার গরিমা নিয়ে ইংরেজের ঐ সব উৎকট উক্তি আর কিছু নয়, তার সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের অতি কুৎসিৎ প্রকাশ। আজ সাম্রাজ্য গিয়েছে, গরিমাও গিয়েছে। আজ আর ইত্যাকার উক্তি করবার সাহস তার নেই। পোলিশ লেখক জোসেফ কনরাড ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লিখে ইংরেজি সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় যে, ওই বিদেশী লেখকের ইংরেজিটা উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট, এ প্রশ্নটা তো তাঁর বেলায় ওঠেনি, রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমনটা উঠেছে। বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে কনরাড স্বাধীন দেশের নাগরিক, তিনি ব্রিটিশ প্রজা নন। কাজেই King's English undefiled-এর তোয়াক্কা তিনি করেননি। খুব যে একটা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এমনও নয়। সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিকের কাজ করতেন। ইংরেজি যে দরেরই হোক কাহিনীর চমৎকারিত্বেই পাঠকের মনোহরণ করেছেন। রবীন্দ্র কাব্যের মাধুর্যও সকলকে মোহিত করেছিল কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রিটিশরাজের প্রজা সেইহেতু রাজভাষার রাজ মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে। এ ব্যাপারে ইংরেজের স্নবারি এমন কুৎসিৎ আকারে প্রকাশ পেয়েছে যে আজকের যে কোন শিক্ষিত রুচিবান ইংরেজ তাতে লজ্জা বোধ করবেন। সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সে রুচিবোধ ছিল না। আর স্নবকে যে সঙ্গে সঙ্গেই স্নাব করতে হয়, সে কথা আমরাও সেদিন ভাবিনি।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেন না কিংবা তাঁর ইংরেজিটা তেমন উঁচু দরের নয়, এমন কথা ইয়েটস প্রকাশ্যে কখনো বলেননি। বেশ কয়েক বছর পরে ম্যাকমিলানকে লেখা একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন। মনে হয় কোন কারণে ম্যাকমিলানের কাছে একটু বাহাদুরি পাবার জন্যেই কথাটি বলেছিলেন। অথচ কাজের বেলায় উল্টোটাই করেছেন। একটি ইংরেজি কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদনা ভার পড়েছিল ইয়েটস-এর উপর। তিনি ঐ সঙ্কলন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সাতটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থটি ইংরেজ কবিদের কবিতা সঙ্কলন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি একজন অনুবাদক হিসাবে নয়। তাঁকে একজন মূল ইংরেজি কাব্য রচয়িতা অর্থাৎ একজন ইংরেজি কবি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব লিটারেচার-এও রবীন্দ্রনাথকে একজন ইংরেজ কবি হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— a minor English poet, এখানে English poet কথাটি লক্ষণীয়। তাঁকে অনুবাদক হিসাবে দেখা হয়নি। 'Minor' কথাটিতে তেমন আপত্তির কিছু নেই কেননা ইংরেজিতে লেখা তাঁর কবিতার পরিমাণ খুব সামান্যই বলতে হবে। কেমব্রিজ হিস্ট্রিতেও তাঁর ইংরেজি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয়নি। ইয়েটস-এর সঙ্কলন গ্রন্থেও নয়।

ভাষার মেরামতি কতখানি মারাত্মক হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত আছে। ইয়েটস-এর ন্যায় রবার্ট ব্রিজেসও একটি কবিতা সঙ্কলনের সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্কলনেও

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একটি কবিতার একটি লাইন ব্রিজেস বদলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে কবিতাটির ভাষা মেরামত করতে গিয়ে তিনি কবিতাটির মর্মে আঘাত করেছেন। বলেছেন, আপনি আমাকে দিয়ে যা বলিয়েছেন আমি তা আদৌ বলতে চাইনি। তা হলেই দেখুন ব্রিজেস রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ঠিক বুঝতেই পারেননি। রবার্ট ব্রিজেস তখন ইংলণ্ডের পোয়েট লরিয়েট। দেখা যাচ্ছে ইংরেজ রাজকবি কবিতাটির উপরে কবিরাজি চিকিৎসা চালিয়েছিলেন। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ আর কাকে বলে ?

বলে নেওয়া ভালো যে গীতাঞ্জলির অনুবাদ নিয়ে এই যে বাদানুবাদ এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অংশত দায়ী। সারা জীবন যত্র তত্র বিনয় করে বলে বেড়িয়েছেন, ইংরেজিটা তিনি ভালো শেখেননি। বিনয় অতি মহৎ গুণ ; কিন্তু বিনয় বচনেরও বিপদ আছে। লোকে বেমালুম বিশ্বাস করে বসে। রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন না এমন নয়, খুব ভালো করেই জানতেন। অমিট রায়ের মুখ দিয়ে সে কথাটি অতি সুন্দর করে বলেছেনও। অমিট নিজেই গিয়েছে নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে। যোগমায়া বললেন—তা বেশ, কিন্তু পাত্রটির গুণাগুণের কিছু পরিচয় তো আবশ্যক—বিদ্যে কি রকম ? অমিট বললে—বিদ্যে স্বয়ং নিউটনের মতো, জানে যে, জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়োচ্ছে মাত্র। কিন্তু সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে বিশ্বাস করে বসে। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য যে তাঁর বিনয় বাক্যটি দেশে-বিদেশে অনেকেই আক্ষরিকভাবে সত্য বলে গ্রহণ করেছে।

ভাষা নিয়ে শুচিবাই বড় হাস্যকর, একেও স্নবারিই বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তো না হয় বিদেশী এবং ভিন্ন ভাষাভাষী লেখক ; এমন যে কবিকুল-তিলক শেক্সপীয়ার, তিনিও তাঁর স্বদেশীয় স্নবদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। সকলেই জানেন যে শেক্সপীয়ার-এর রচনায় ভাষাগত ভুলচুক আছে—কোথাও কোথাও অতি সাধারণ ব্যাকরণের ভুল। অষ্টাদশ শতকে এক দল ইংরেজ পণ্ডিত শেক্সপীয়ার সংশোধনে লেগে গেলেন্। বহু পরিশ্রমে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে বিশুদ্ধ শেক্সপীয়ার রচনাবলী প্রকাশ করা হল। কিছুকাল পরে উনিশ শতকে আবার সুবুদ্ধির উদয় হল। এবারে পণ্ডিত সমাজ নয়, ইংলণ্ডের রসিক সমাজ বললে—অ্যাঁ, কত বড় আস্পর্ধা, শেক্সপীয়ার-এর উপরে বিদ্যে ফলানো। তাঁর লেখার উপরে কলম চালানো হয়েছে। সংশোধিত রচনাবলী বাতিল করে দিয়ে প্রচলিত সংস্করণে যেখানে যে ভুল ছিল, সেই সব ভুল আবার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হল। আদি এবং অকৃত্রিম শেক্সপীয়ার পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। আমাদের ভাষায় মুনি ঋষিদের ভুলকে যেমন আর্যপ্রয়োগ হিসাবে শিরোধার্য করে নেওয়ার রীতি ছিল, ইংরেজ রসিক সমাজও সেদিন শেক্সপীয়ার সম্পর্কে সেই সশ্রদ্ধ ভাবই গ্রহণ করেছিল। কবির উপরে কারসাজি করতে যাওয়াটা যে রসজ্ঞানের পরিচায়ক নয় সে কথা সব সময়ে সকলের মনে থাকে না।

এই সূত্রে একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কবি কি ভেবে কি বলেছেন, সে কথা কবি নিজে যতখানি জানেন, অপরে ততখানি নয়। রবার্ট ব্রিজেস কৃত সংশোধনের বেলাতেই দেখা গিয়েছে যে খোদার উপর খোদকারির ন্যায় কবির উপরে কবিরাজি করতে গেলে ফল বড় ভালো হয় না। ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট অধিকার ছিল। সেজন্যে বলতে কোন দ্বিধা নেই যে কবিকৃত অনুবাদই সব চাইতে বেশি

authentic নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

লক্ষ করবার বিষয় যে গীতাঞ্জলি ছাড়াও পরে আরো কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। ইংরেজ পণ্ডিতরা তাতে হস্তক্ষেপ করবার খুব একটা সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। ইয়ুরোপের দেশে দেশে নানা ভাষায় সে সব ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং প্রচুর সমাদরও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি মারফত রসগ্রহণে তো কোন বাধা হয়নি। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী স্প্যানিশ কবি হিমেনেথ ইংরেজিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য সমস্ত গ্রন্থই স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে হিমেনেথ একটি কবিতায় বলেছিলেন 'সেই কবে তোমার ছন্দের দোলা এসে লেগেছিল আমাদের স্প্যানিশ কাব্যে ; সেই ছন্দের অনুরণন আমাদের কাব্যে আজও থেমে যায়নি।' দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু ইংরেজি জানতেন তার জোরেই জগৎ জয় করেছেন।

যাক, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিটা ভালো কি মন্দ সেটা একটা মস্ত বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি ইংরেজি আদৌ নাও জানতেন তা হলেও তাঁর মনীষার বা কবি মহিমার কোন হানি হত না। পৃথিবীর কত কত মনীষী ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাতে কি তাঁদের কোন ক্ষতি হয়েছে? সংস্কৃতকে দেবভাষা এবং ইংরেজিকে রাজভাষা আখ্যা দিয়ে দুটি ভাষাকেই আমরা অহৈতুক মর্যাদা দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবি, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন বাংলা ভাষার মাধ্যমেই অর্থাৎ তাঁর মূল বাংলা গ্রন্থাদি থেকেই করতে হবে।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের এবং সকল ভারতবাসীরই ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে ইয়েটস যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন তাতে আমাদের ইংরেজি বিশারদদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেও বড় বিচিত্র। তাঁদের ক্ষোভ ইয়েটস-এর বিরুদ্ধে যতখানি, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও ততখানি। দেখুন তো কাণ্ড, উনি ইস্কুলে কলেজে পড়েননি, ইংরেজি ভালো করে শেখেননি, আনাড়ি হাতে ইংরেজি লিখতে যাবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? ভাবটা যেন রবীন্দ্রনাথের 'নড়বড়ে' ইংরেজির দরুন এঁদেরই লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছে, মানসম্মান খোয়া গিয়েছে। সেই কবেকার ব্যাপার, কিন্তু এখনও কিছুদিন পরে পরেই গীতাঞ্জলির ইংরেজি সম্পর্কে আমাদের পত্রপত্রিকায় একটা আলোচনা শুরু হয়।

সম্প্রতি নবীন ইংরেজ কবি উইলিয়াম র‍্যাডিচে কৃত রবীন্দ্রকাব্যের একটি অনুবাদ গ্রন্থ পেঙ্গুইন সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনুবাদে ইংরেজ পাঠকসমাজ যদি রবীন্দ্রকাব্যে অধিকতর স্বাদ এবং রস গ্রহণে সক্ষম হন তা হলে খুবই সুখের কথা হবে। কিন্তু র‍্যাডিচেকে নিয়ে কদিন ধরে কলকাতায় যে প্রচণ্ড হৈ চৈ হল, তা দেখে বড় অদ্ভুত ঠেকেছে। মনে হয়েছে, এতদিনে যেন রবীন্দ্রনাথের একজন saviour বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কৃতার্থ করেছেন এবং আমাদের মুখরক্ষা করেছেন। অথচ র‍্যাডিচের সঙ্গে সামান্য যেটুকু কথাবার্তা হয়েছিল তাতে তেমন কোন মনোভাবের পরিচয় পাইনি। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ। কষ্ট করে বাংলা শিখেছেন, রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করেছেন গভীর আগ্রহে, অনুবাদ করেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু আমরা যে কাণ্ড করেছি তাকে বলে আদেখলেপনা। আমরা কোন ব্যাপারেই সঙ্গতি রক্ষা করতে জানি না। কথায়

কাজে ব্যবহারে ডিগনিটি রক্ষা করে চলি না। পরিমিতিবোধের অভাবে যে আতিশয্য ঘটে তাই থেকেই স্নবারির জন্ম।

যাক, স্নবারির কথা অনেক হল। আমি নিজেও যে একটি স্নব, সে কথার উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু কথাটা খুলে বলা হয়নি। বললে স্নবারির আরেকটা দিক উদঘাটিত হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একটি ভক্তমণ্ডলী যেমন সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকতেন, মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আজও অপর একটি ভক্ত সম্প্রদায় তাঁকে নিয়ে দিব্যি আসর জমিয়ে রেখেছেন। আমি উক্ত সম্প্রদায়ের একজন। রবীন্দ্র স্মরণ সভা এখন একটি উৎসবের আকার ধারণ করেছে, কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে। নৃত্যগীতাদির সঙ্গে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা থাকে। ইংরেজি নাটকের আদি যুগে মিস্ট্রি (Mystery) এবং মরালিটি (Morality) প্লে-তে যেমন ইন্টারলিউড বা কৌতুকাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকত এও তেমনি। উক্ত নাটকগুলি ছিল সাধারণত ধর্মীয় পালা। ধর্মকথা লোকে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ শুনতে পারে না, মন মেজাজ খারাপ হয়। সেজন্যে মাঝখানে হাল্কা ধরনের কিছু কৌতুকের ব্যবস্থা রাখা হত। রবীন্দ্র উৎসবে অবশ্য ব্যাপারটা উল্টো। নৃত্যগীতই প্রধান এবং উপভোগ্যও বটে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের ভয়, পাছে কেউ বলে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি লোককে শুধু নাচিয়ে বেড়াতেন—এই ভয়ে নৃত্যগীতের ফাঁকে কিছু প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। খুবই ভুল ধারণা, কেননা, বক্তৃতার চাইতে নৃত্যগীতের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে ঢের বেশি সহজে পাওয়া যাবে। এই কারণে রবীন্দ্রোৎসবে প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতাকেই আমি ইন্টারলিউড বা কৌতুকাভিনয় আখ্যা দিয়েছি। আমি নিজে সেই ইন্টারলিউড-এর একজন অভিনেতা। কারণ উৎসবের উদ্যোক্তারা কখনো সখনো তাঁদের সভায় ভাষণ দেবার জন্য আমাকে আহ্বান করে থাকেন। তাঁরা কি ভেবে আমাকে একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ বলে ঠাহর করেছেন, আমি জানি না। তবে আমার অনুমান, যে সব মহৎ গুণের জন্য আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করা হচ্ছে তা হল—আমি রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছি, তাঁর মুখের কথা শুনেছি, বিশ্বভারতীর চাকুরি করেছি এবং শান্তিনিকেতনে বসবাস করছি। শান্তিনিকেতনে বাস করলেই রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়, দেখা যাচ্ছে এরূপ একটি কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। সত্যি বলতে কি, এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেননি, শান্তিনিকেতনে কোন কালে যাননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মর্ম আমার চাইতে ঢের বেশি বুঝেছেন। তাঁরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত নন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে ঐ ভ্রান্ত ধারণাটির পূর্ণ সুযোগ নিতে আমি দ্বিধা করি না এবং কোথাও থেকে আহ্বান পেলে অসঙ্কোচে গিয়ে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। বলাবাহুল্য, এটি একটি খাঁটি স্নবের ভূমিকা।

আরেকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। আজ কত বছর ধরে দোল দুর্গোৎসবের ন্যায় রবীন্দ্রোৎসব বাঙালি জীবনে একটি অবশ্য পালনীয় পার্বণে পরিণত হয়েছে। কবি সাহিত্যিককে নিয়ে এ ধরনের উৎসব পৃথিবীর কোন দেশেই হয় না। এ শুধু আনন্দের কথা নয়, গর্বের কথা। প্রমাণিত হচ্ছে যে অনেক গিয়ে-থুয়েও বাঙালির মূল্যবোধ এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। মূল্যবানকে সে মূল্য দিতে জানে। প্রচুর উৎসাহে, পরম নিষ্ঠায় সে উৎসবটি পালন করে। তাহলেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে

উৎসাহের আতিশয্যে যেন ভুলে না যায় যে উৎসবটি এখনও অতি ক্ষুদ্র একটি উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। দেশে শতকরা সত্তরজন মানুষ নিরক্ষর; অক্ষর পরিচয় আছে মাত্র ৩০ জনের। বলা নিষ্প্রয়োজন যে অক্ষর পরিচয় থাকলেই রবীন্দ্রসাহিত্যের রস গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বেশি কিছু চাই না, স্কুলের উচ্চতর শ্রেণী অবধি পড়াশুনা করেছে এমন হলেই বয়স বাড়বার সঙ্গে সহজাত বুদ্ধিতে মোটামুটি রসগ্রহণে সক্ষম হবে বলে মনে করি। কিন্তু সে হিসেবেও দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা সারা দেশে শতকরা দশ জনের বেশি নয়। শতকরা নব্বুই জনের কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন অস্তিত্বই নেই। আমাদের দেশের ঐ তো ব্যাধি। দেশে অন্ন বস্ত্র বলুন, বিলাসদ্রব্য বলুন, কোন সম্পদেরই অভাব নেই, কিন্তু সমস্তই অল্পসংখ্যকের করায়ত্ত, বারো আনা মানুষ বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তাই হয়েছে। দুই বঙ্গ মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা বোধকরি দশ-বারো কোটির বেশি ছাড়া কম নয়। তার মধ্যে যদি লাখ দশেক লোক মিলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করে তাহলে রবীন্দ্রনাথের জয় ঘোষিত হয় না, তাঁর পরাজয়ই প্রমাণিত হয়। সত্যি বলতে কি, শান্ত মনে যদি ভেবে দেখি তাহলে আমাদের মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তীকে মনে হবে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একটি সুপরিকল্পিত স্ববারি। নিরক্ষরতা দূর করে প্রতিটি বাঙালি ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছিয়ে দিতে পারলে তবেই উৎসব সার্থক হবে। ভুললে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথকে এখনো আমাদের ঘরে আনা হয়নি, তাঁকে আজও বর্হিদ্বারেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলছি—'যতই উঠে হাসি,/ ঘরে যতই বাজে বাঁশি,/ যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে/ যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সেকথা রয় মনে/ যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'

রবীন্দ্র সকাশে

আমার যখন জন্ম তখন রবীন্দ্রনাথের জীবন অর্ধেক অতিক্রান্ত। পূর্ববঙ্গের ছেলে। কলকাতার কলেজে পড়তে এসেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ হল। সেটা ১৯২২ সালের কথা। সে দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিদ্যাসাগব স্মৃতিসভায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। এমন সুললিত বাংলায় এমন অনর্গল ভাষণ এর আগে কখনো শুনিনি। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম। কোন কোন কথা এখনো কানে বাজে—'মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রামে এ বিদ্রোহের আগুন কি করে জ্বলল!' বক্তৃতা শেষে শ্রোতাদের অনুরোধে একটি গানও করেছিলেন---'অন্ধ জনে দেহ্ আলো'। তাঁর গলায় আমি ওই একটি গানই শুনেছি।

সেই প্রথম দর্শনের পরে রবীন্দ্রনাথ আর উনিশটি বছর মাত্র জীবিত ছিলেন। ওই উনিশ বছরে আরো কয়েকবার তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। তখন তাঁর বয়স ষাট উত্তীর্ণ। তাহলেও নানা উপলক্ষে তিনি কলকাতায় আসতেন, বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করতেন। প্রত্যেকটি সভাতেই উপস্থিত থেকেছি, একটিও বাদ পড়েনি। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে যখন কলকাতায় গানের আসর জমিয়েছেন তখন টিকিট কেটে সে গান শুনেছি, তাঁর মুখে কবিতা পাঠ শুনেছি, 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখেছি। এর অনেক পরে শান্তিনিকেতনে একটিবার মাত্র তাঁর সুমুখে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। তখন তিনি অসুস্থ, তথাপি সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছিলাম, তবে অতি অল্পক্ষণের জন্য। আরো দুজন ছিলেন। শুধু প্রণাম নিবেদনই উদ্দেশ্য ছিল, কথাবার্তা কিছুই বলিনি। না বলে ভালোই করেছি। এত কথা বলার ছিল যে, বলতে গেলে সবই গোল পাকিয়ে যেত। তাছাড়া, এর আগে প্রতিবারেই দেখেছি দূর থেকে, এই প্রথম দেখলাম একেবারে কাছে থেকে। মানুষের চেহারায় যে এমন grandeur থাকতে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন হত। কী তাঁর গাত্রবর্ণ, যেন অগ্নিময় এক পুরুষ। সাহিত্যিক বন্ধু সন্তোষ ঘোষ বলেছিলেন, মশায় বলব কি, প্রণাম করতে ভয় করছিল, পাছে হাতে ছ্যাঁকা লেগে যায়। অত্যুক্তি হলেও সাহিত্যিকসুলভ সার্থক বর্ণনা বলতে হবে। আমার এক বন্ধুর মুখে একটি মজার কাহিনী শুনেছিলাম। বন্ধুটি শান্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র। অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর ছ-সাত বছরের ছেলে। ছেলেকে নিয়ে আশ্রম ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। অদূরে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে, তাঁকে ঘিরে আরো কয়েকজন। শীতের সকাল, রবীন্দ্রনাথের গায়ে একটি ফ্লানেলের জোব্বা।

গাছের ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে মুখে-চোখে। কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছে সে বলার নয়। ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, ছেলে তাঁর জামার হাতা ধরে টানছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলছে, বাবা এ মানুষ ? ছোট ছেলের মনে যে বিস্ময়, বড়দের মনেও তার চাইতে কিছু কম নয়। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দেখে হকচকিয়ে যাননি এমন মানুষ কমই আছেন। আর্নেস্ট রীজ পৃথিবী বিখ্যাত এভরিম্যান লাইব্রেরীর সর্বাধ্যক্ষ, তদুপরি খ্যাতনামা ইংরেজি সাহিত্যিক। সেই গীতাঞ্জলির যুগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সদ্য পরিচয় হয়েছে। একদিন সকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ হাঁটিতে হাঁটিতে এসেছেন মিঃ রীজ-এর বাড়িতে। দরজায় টোকা দিতেই রীজ নিজেই এসে দরজা খুললেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলেন। বলেছেন— 'For a moment I was abashed: it was as if the Prophet Isiah had come to one's door.'

যাক আবার নিজের কথাতেই ফিরে আসছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্তই চাক্ষুষ বলতে হবে। কেননা, বাক্যালাপের সুযোগ হয়নি। অথচ কবির সঙ্গে আমার পিতৃদেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। দেখা-সাক্ষাৎ বোধকরি দু-একবারের বেশি নয়, কিন্তু বেশ কিছুকাল পত্রালাপ ছিল। পিতাকে লেখা কবির সে সব চিঠি রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত আছে। শান্তিনিকেতনে সেই একবার যখন তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন পিতৃপরিচয় দিলে হয়তো আমাকে চিনতে পারতেন, কিন্তু কবির তত্ত্বাবধায়করা বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভয়ানক ক্লান্ত, তাঁকে যেন কোন মতেই উৎপীড়ন না করি। কাজেই কথা বলার কোন অবকাশ হয়নি। চোখের দেখাই বা কতটুকু দেখেছি। সেই প্রথম দর্শনের পরে যে উনিশটি বছর তিনি বেঁচেছিলেন তাতে বড়জোর বার পনেরো দেখেছি। উনিশ বছরে উনিশবারও নয়, কারণ তিনি মাঝে মাঝেই বিদেশে চলে গিয়েছেন।

আর ক'দিন পরেই আমার জীবনের নব্বই বছর পূর্ণ হবে। সারা জীবনে ওই তো বার কয়েক মাত্র দর্শন লাভ হয়েছে। তথাপি যদি বলি আমার গোটা জীবনই অর্থাৎ নব্বই বছরই কেটেছে রবীন্দ্র সকাশে, তাহলে আপাতশ্রবণে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু বস্তুতপক্ষে কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। সে কথাটাই বলতে বসেছি।

একান্তভাবে রবীন্দ্র প্রভাবিত একটি পরিবারে আমার জন্ম। জন্মাবধি রবীন্দ্রনাথের কথা যত শুনেছি, দেবদেবীর কথা কিংবা রাজারাজড়ার গল্পও তত শুনিনি। সবে যখন মুখে কথা ফুটেছে, সেই তখনই বড়দেয় মুখে শোনা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আধ-আধ বুলিতে আওড়িয়েছি। তারও আগের কথা বলি। স্বদেশী আন্দোলনের কালে আমি নিতান্ত শিশু। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান গেয়ে আমাকে ঘুমপাড়ানো হত। তাহলেই দেখুন, আমায় ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এখন অবশ্য ভাবলে হাসি পায় যে, সে সব গান প্রকৃতপক্ষে ঘুমপাড়ানিয়া গান নয়, ঘুম ভাঙানিয়া গান। সেই তখন ওসব গান দিয়েই দেশবাসীর ঘুম ভাঙিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘুম ভাঙানো, মন জাগানোই কবির প্রধান কাজ।

সেই শিশুকাল থেকে তাঁর কথা এত শুনেছি, ভেবেছি, তাঁর কবিতা আওড়িয়েছি, বুঝি বা না বুঝি তাঁর লেখা হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই পড়েছি—সব মিলিয়ে তাঁকে অত্যন্ত চেনা জানা, আপনজন বলে মনে হত। ছেলেমানুষ মনে এত বেশি আপনার

বলে ভাবতাম যে, শুনে আপনারা হাসবেন, একবার আমার দাদাতে আর আমাতে মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমরা তাঁকে মিষ্টি খাবার জন্যে টাকা পাঠিয়েছিলাম। সেই বয়সে আমরা ভাবতাম জন্মদিনটা আর কিছু নয়, একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। কালীমোহন ঘোষ মশায় বাবাকে চিঠিতে লিখছেন, গতকাল কবির সঙ্গে কলকাতায় আসছিলাম, ট্রেনে কবি পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে হাসতে হাসতে পড়তে লাগলেন। বলা বাহুল্য এটি আমাদের সেই চিঠি। কালীমোহনবাবু লিখেছেন, ছেলেদের বলবেন, কবি শীঘ্রই ওদের চিঠির জবাব দেবেন। চিঠির জবাব পেতে সত্যি বিলম্ব হয়নি। আমাদের স্নেহাশিস জানিয়ে লিখেছিলেন—'আমার জন্মদিনে তোমরা আমাকে যা খাওয়ালে তা একেবারে রাজভোগ।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সারা দেশে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের রেওয়াজ হয়েছে কবির মৃত্যুর পর থেকে। কিন্তু আমাদের পরিবারে আজ থেকে আশি-পঁচাশি বছর আগেও ২৫শে বৈশাখ একটি উৎসবের দিন ছিল।

বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথকে যে একটি মস্ত বড় আনন্দের উৎসরূপে জেনেছিলাম সেটা আমাদের পিতৃদেবের দৌলতেই হয়েছিল। কাব্য সাহিত্যের রস উপভোগের ক্ষমতা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। মনে আছে, সবে তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছি, পিতা একদিন রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ 'নদী' কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। কী সুন্দর করে যে পড়েছিলেন কি বলব, আজও কানে যেন লেগে আছে। আরো পরে, বয়স বারো-তেরো হবে, 'ছিন্নপত্র'র কিছু কিছু অংশ আমাদের পড়ে শোনাচ্ছিলেন। পড়া শুনতে শুনতে যেন সোনার খনির সন্ধান পেলাম। 'ছিন্নপত্র' সেই যে আমাকে পেয়ে বসেছিল, আজ পর্যন্ত তার মোহ কাটেনি। কতবার যে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ছে অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম,—'ছিন্নপত্র' আমার বাইবেল। আজ যদি দু-কলম লিখবার ক্ষমতা হয়ে থাকে তা ছিন্নপত্রের দৌলতেই হয়েছে। রম্য রচনার প্রথম পাঠ নিয়েছি ছিন্নপত্রের পাতা থেকে।

পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল আমাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবেন শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও তেমনি একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই বালক কাল থেকেই। শেষ পর্যন্ত সেই শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল বৈকি, কিন্তু ছাত্র হিসাবে নয়, শিক্ষক হিসাবে। সেও এক অতি রোমাঞ্চকর ঘটনা। সে কথা পরে বলব। দুঃখের কথা, শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পাইনি, তিনি তার আগেই গত হয়েছেন। ইতিমধ্যে বয়স বাড়বার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা বেড়েছে, রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু কিছু রোম্যান্টিক বা পোশাকী ধারণা পরিহার করতে হয়েছে।

বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথকে যত কাছের মানুষ, যত আপনজন ভাবতাম, কলকাতায় এসে ক্রমেই মনে হতে লাগল, আমার কাছে তিনি আর তত কাছের মানুষ নন। যখনই যেখানে দেখেছি সেখানেই দেখতাম বহু লোক তাঁকে ঘিরে আছেন। সপ্তরথী নয়, শত রথীর ব্যূহ ভেদ করে কোনদিন যে তাঁর কাছে যেতে পারব এমন ভরসা হয়নি। দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখেছি। বাবা বলতেন রবিবাবু। আমরাও রবিবাবু বলেই জানতাম। কলকাতায় এসে সেই রবিবাবুকে ফেললাম হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন রাজসমারোহে—আর আমি দীন যথা রাজেন্দ্রসঙ্গমে। কত

কথা বলবার ছিল, বলা হল না। কত কথা শুনবার ছিল, শোনা হল না। মুখের বচনের তো আশা ছিল না, ডাকের বচনের কথা ভাবতাম। চিঠি লিখলে কেমন হয় ? কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। ছেলে বয়সে মানুষকে বিরক্ত করবার যে সাহস থাকে, একটু বড় হলে সে সাহস আর থাকে না। নইলে মনে মনে কত চিঠি যে তাঁকে লিখেছি তার সীমা সংখ্যা নেই। সে সব চিঠি কল্পনাতেই থেকে গিয়েছে, বাস্তব রূপ পায়নি। অথচ পরে জেনেছি, তিনি সকলের সকল চিঠিরই জবাব দিতেন।

আমার চাইতে পিতৃদেব অধিকতর ভাগ্যবান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো বটেই, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নানা সূত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। কালীমোহনবাবুর মাধ্যমে ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় একবার পূর্ব্ববঙ্গ পর্যটনে গিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রভাতবাবুর 'ফিরে ফিরে চাই' নামক গ্রন্থে ঐ সাক্ষাতের বিবরণ আছে। ক্ষিতিমোহনবাবুও আমার পিতার সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। আমার পিতা রবীন্দ্রনাথের আদিতম ভক্তদের অন্যতম। সে কারণেই আমার পিতার সম্পর্কে এঁদের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। গত শতকের নব্বুই-এর দশকে পিতা যখন কলেজের ছাত্র, সেই তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের গভীর অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন অনধিক ত্রিশ বৎসরের যুবক। কবি হিসাবে তাঁর পরিচয় তখনও পরিচিত মহল ছাড়িয়ে খুব বেশি দূরে বিস্তৃত হয়নি। তখনকার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য রচনা যখন যা কিছু প্রকাশিত হত আমার পিতা তার সমস্তই সাগ্রহে সংগ্রহ করতেন। পিতার সেই সংগ্রহ আমাদের পরিবারের এক মস্ত বড় সম্পদ। দেশ বিভাগের পরে সব নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, অনেক জিনিস খোয়া গিয়েছে। 'ভারতী' এবং 'সাধনা' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। দুটি পত্রিকারই সব খণ্ড অতি যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। ঐ বাঁধানো ভল্যুমগুলো অবশ্য আনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতন যখন রবীন্দ্রভবনের প্রতিষ্ঠা হয় তখন দেখা গেল বিশ্বভারতীর সংগ্রহে 'ভারতী' 'সাধনার' সবগুলি খণ্ড নেই। নিখোঁজ খণ্ডসমূহ কোথা থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করা যায় তাই ভেবে কর্তৃপক্ষ যখন বিষম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তখন আমার পিতৃদেব তাঁর সমস্ত সংগ্রহটি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে দান করেন।

পিতা ছিলেন স্কুলের হেড মাস্টার। ছাত্রদের শুধু পরীক্ষা পাশের পড়া পড়িয়েই ক্ষান্ত হননি। রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্য পাঠে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যে নতুন জীবনের বার্তা এনে দিয়েছেন সেই বার্তাটি প্রচার করাই তাঁর শিক্ষক জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। তিনি শুধু রবীন্দ্র-ভক্ত নন, রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ প্রচারক। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মশায় তাঁর 'রূপনারায়ণের কূলে' নামক জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থে আমার পিতার ঐ কাজের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে কালীমোহন ঘোষ মশায়ের নামও করেছেন। বলেছেন—"চাঁদপুরের বাবুরহাট স্কুলের হেড মাস্টার পুণ্যশ্লোক সারদাচরণ দত্ত মহাশয় এবং তৎকালীন চাঁদপুরের কালীমোহন ঘোষ মহাশয়—পূর্ব্বাংলার চাঁদপুরের ঐ অঞ্চলটিতে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোক শতাব্দীর প্রথম দশকেই বিকিরিত হয়েছিল ঐ দুজন রবীন্দ্র প্রতিভামুগ্ধ মানুষের দ্বারা।" কাজটি যে বড় সহজ ছিল না, সে কথাটিও

গোপাল হালদার মশায় বলেছেন বড় সুন্দর করে। বলেছেন, "সেদিন পূর্ব বাংলায় এক-আধজন যাঁরা দূর দূর জেলায় ও গ্রামে রবীন্দ্র কাব্য ও রবীন্দ্র ভাবনা বুঝে উঠেছিলেন, তাঁরা ছিলেন অনেকটা দল-হারা, সঙ্গীহারা, ঘরের বাইরের সমাজে প্রায় একক। তুলসীতলায় এক-একটি মাটির প্রদীপ। রবীন্দ্রনাথের পলতে জ্বালিয়ে তাঁরা আঙিনার আঁধার খানিকটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। চাঁদপুরের ঐ অঞ্চলে তাই ঘটেছিল বাবুরহাটের হেড মাস্টার সারদাচরণ দত্ত মশায়ের চেষ্টায়।"

আমার শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্র-দীক্ষাও পিতৃদেবের কাছে পাওয়া। ইস্কুল জীবন কেটেছে গ্রামের ইস্কুলে পড়ে, গ্রামের পরিবেশে থেকে। কিন্তু কলেজে পড়তে গিয়ে হস্টেলে শহুরে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পরে আবিষ্কার করলুম, তাদের অনেকের চাইতেই আমার জগৎটা বেশ একটু বড়। সে জগতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন পিতৃদেব, সস্নেহে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র জগতে---সেখানে ছন্দের দোলা, সুরের খেলা, আনন্দের মেলা। ক্রমে সন্ধান পেয়েছি নতুন নতুন রোমাঞ্চের---জানবার শিখবার ভাববার রোমাঞ্চ। জগতটার বিস্তার এ ভাবেই বেড়েছে, মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আর কিছু না হোক একটি আনন্দময় জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম। সেখানে ক্ষণে ক্ষণে অকারণ পুলক, ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ের চমক। চমক-লাগানো, মন-জাগানো বিস্ময়ের রোমাঞ্চকর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। ইংরেজি রোম্যান্টিক সাহিত্যে একে বলেছে renaissonce of wonder. আমাদের অভ্যাস-জীর্ণ চোখ কোন কিছুতেই নতুনত্ব বিশেষত্ব খুঁজে পায় না। কবি-মনের ছোঁয়া লেগে অতি-পুরাতন হয় সদ্যোজাত নতুন, সামান্য হয় অসামান্য, মূল্যহীন হয় মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায়---'মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে তার।' বিস্ময়জাত রোমাঞ্চ এবং রোমাঞ্চ-জাত আনন্দ আমাব সুদীর্ঘ জীবনকে সজীব রেখেছে। এই সজীবতা রবীন্দ্রনাথের দান, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব।

তথাপি মনের কোণে একটি অভিমান বাসা বেঁধে ছিল বহুকাল। ভাবতাম, আমি এত যে রবীন্দ্র-অন্ত প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ কি তা জানেন? তিনি তো আমার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সজ্ঞান নন। আরো ভাবতাম, যাঁরা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পরিবার-ভুক্ত, তাঁরা কি আমার চাইতে বড় রবীন্দ্র-ভক্ত? এ সব ভেবে শান্তিনিকেতনের প্রতিও মনটা বেঁকে বসেছিল। উৎসবাদিতে যাবার লোভ হত, তবু যাইনি। অবশেষে অভিমান ভাঙালে শান্তিনিকেতনই, প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথই। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। ছিলাম জামশেদপুরে। সেখানে টাটার ইস্কুলে মাস্টারি করছিলাম। ভালই ছিলাম, দুজন সমধর্মী সহকর্মী এবং কিছু উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে ইস্পাত নগরীতে একটি সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলাম। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা সেখানে আগে থেকে ছিল না, এমন নয়। অতিরিক্ত সাহেবিয়ানায় সেটা চাপা পড়ে যেত। আমরা যে যুব সমাজটি গড়ে তুলেছিলাম, বলাবাহুল্য তার অদৃশ্য নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকেই ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক হিসাবে দেখেছি। পিতৃদেবের ন্যায় আমিও একজন রবীন্দ্র প্রচারক, এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। ভালই চলছিল, হঠাৎ নানা রকম জটিলতা দেখা দিল। জট পাকিয়েছি গোড়ায় আমি নিজেই। ইস্কুলের কাজটি দিয়েছিলাম ছেড়ে।

খামখেয়ালিপনা আমার স্বভাবগত, এটিও তারই নিদর্শন। অর্থাগমের পথটি বন্ধ করে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত নিজেই একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়েছি। ওদিকে দুনিয়াসুদ্ধুই একটা অনিশ্চয়তার অবস্থা দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ বেঁধেছে পশ্চিম মহাদেশে, দেশের আবহাওয়াটা থমথমে, রাজনৈতিক আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অচিরে ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। ঝড় এসেও গেল ; গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিলেন। একটা কথা আগে খেয়ালই করিনি—এই যে আমাকে ঘিরে ছেলে-ছোকরাদের একটা জটলা, এটা পুলিশ আদৌ সুনজরে দেখেনি। তারা ভেবেছে, সাহিত্য সংস্কৃতিটা লোক-দেখানো, আসলে এটি একটি রাজনীতির চক্র। তাদের মতে যেখানে চক্র, সেখানেই চক্রান্ত। অতএব আন্দোলন শুরু হবার অত্যল্পকাল পরেই এক রাত্রে পুলিশের শুভাগমন হল। কয়েক মাস কারাবাসে কাটল। ছাড়া পেয়ে জামশেদপুরে ফিরে এলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই পুনরায় পুলিশের শুভাগমন। আদেশে জারি হল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে টাটানগর এবং সিংভূম জেলা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবারে সত্যি বিপদে পড়া গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কোথায় যাই! নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হল। নিরুপায় হয়ে কিংকর্তব্য ভাবছি এমন সময় একখানা চিঠি হাতে এলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি টাটা স্কুলের হেড মাস্টার, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর স্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়াতে অতিশয় মর্মাহত হয়েছিলেন। চিঠি লিখেছেন তাঁর জামাতা ক্ষিতীশ রায় : তিনি তখন বিশ্বভারতীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মী। লিখেছেন, আমাদের একজন ইংরেজির অধ্যাপক প্রয়োজন। হীরেনবাবু কি আসতেন? তিনি রাজি থাকলে তাঁকে অবশ্যই নেওয়া হবে। খবরটা শুনে যেমন বিস্মিত তেমনি পুলকিত। যে মুহূর্তে আমি নিজেকে নিরাশ্রয় ভাবছি সে মুহূর্তেই আশ্রয়ের আশ্বাস এল শান্তিনিকেতন থেকে! এই অত্যাশ্চর্য coincidence বা অভিনব যোগাযোগটি আমার জীবনের সব চাইতে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। মনে হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেন অদৃশ্য থেকে ডেকে ডেকে বলছেন, কে বললে তুই নিরাশ্রয়, তোর আশ্রয় আমার আশ্রমে। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল, আমি চিরন্তর রবীন্দ্র সকাশেই আছি।

এলাম শান্তিনিকেতনে। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় পিতৃদেব বলেছিলেন, আমাকে পাঠালেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য। এত দিনে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, তাঁরও, আমারও। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন কাজে যোগ দিতে গিয়ে মনে হল, এতদিনে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম! নিজেকে ছাত্র বলেই মনে করেছি, শিক্ষক বলে নয়। অনেক শিখেছি, অনেক পেয়েছি শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তখন নেই, কিন্তু তিনি যে শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন সে শান্তিনিকেতন তখনও অটুট। আমি অনেক সময়ে ভেবেছি, শান্তিনিকেতন নামটা মহর্ষির দেওয়া ; রবীন্দ্রনাথের হাতে সে শান্তিনিকেতন হয়েছিল আনন্দনিকেতন। আনন্দই শান্তিনিকেতনের মূল মন্ত্র। সে আনন্দ নিতান্ত একটা হৈ চৈ ফূর্তির ব্যাপার নয়। গুণকর্মজাত স্বতস্ফূর্ত সে আনন্দের বিশেষ একটা চরিত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন 'আনন্দ চিত্তমাঝে, আনন্দ সর্ব কাজে' তারই দোলায় শান্তিনিকেতনের জীবন নিত্যদিন আন্দোলিত থাকত। কবি গান রচনা করেছেন, ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে নিয়ে গানের জলসা জমাচ্ছেন, নাটক লিখেছেন, ছেলেমেয়ে অধ্যাপকদের নিয়ে নাটকের

মহড়া চলছে। ওদিকে নন্দলাল, বিনোদবিহারী ছবি আঁকছেন, রামকিঙ্কর মূর্তি গড়ছেন, ক্ষিতিমোন সেন মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী প্রচার করছেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা করছেন। গুণচর্চা শুধু শিল্পী, বিদ্বান পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। আমরা নগণ্যরাও সাধ্যমত কিছু করবার চেষ্টা করেছি। ছেলেমেয়েরাও গুণপনা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে—কেউ সুরেলা গলায়, কেউ অভিনয় রচনায়। আশ্রমবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ওই আনন্দমেলার শরিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানেও শান্তিনিকেতনের ওই আনন্দময় জীবনধারাটি বেশ কিছুদিন অক্ষত ছিল। শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম দশ বছরের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তার পরে চোখের সুমুখেই দেখেছি, শান্তিনিকেতন বদলাচ্ছে, বিশ্বভারতী বদলাচ্ছে। চেহারায়, স্বভাবে এতই বদল হয়েছে যে আজ তাকে চেনা দায়। যাক, তাই বলে আমার শান্তিনিকেতনকে আমি হারাইনি। যে শান্তিনিকেতনকে একদিন ভালোবেসেছিলাম—সেই আমার প্রথম দশ বছরের শান্তিনিকেতন আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। আর রবীন্দ্রনাথ ? ঠিক যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। কৈশোরে যৌবনে যেমন ছিলেন আমার কল্পলোকের সঙ্গী, আজ জীবন সায়াহ্নেও তিনি আমার সকল চিন্তায় সকল কর্মে নিত্যদিনের সঙ্গী। সারাজীবন রবীন্দ্র সকাশেই কাটল।